মসলা ও তেলজাতীয় ফসলের জাত পরিচিতি ও উৎপাদন কলাকৌশল ম্যানুয়াল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative

মসলা ও তেলজাতীয় ফসলের জাত পরিচিতি ও উৎপাদন কলাকৌশল ম্যানুয়াল

সংকলন

রেজওয়ানা রহমান
উপজেলা কৃষি অফিসার (এল আর)
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা এবং কো-পিআই, AFACI-RATES প্রকল্প

অনিন্দিতা রায়
মনিটরিং অফিসার
লাভজনক পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি
খামারবাড়ি, ঢাকা

সহযোগিতায়

ড সুরাইয়া পারভীন
পরিচালক (টিটিএমইউ) এবং পি আই, AFACI-RATES প্রকল্প

ড. রবিউল আলম
কো-পিআই, AFACI-RATES প্রকল্প এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
সরেজমিন গবেষণা বিভাগ,
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative

প্রকাশকাল

এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি.

প্রকাশনায়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।

অর্থায়নেঃ

Improvement of Rural Agricultural Technology Extension System in Asia (RATES) Project

ডিজাইনেঃ

সবুজ শেখ

মুদ্রণেঃ

মোনাক্স সলিউশন

৯৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

মুখবন্ধ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative (AFACI), Korea এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Improvement of Rural Agricultural Technology Extension System in Asia (RATES) প্রকল্পের আওতায় "মসলা ও তেল জাতীয় ফসলের জাত পরিচিতি ও উৎপাদন কলাকৌশল ম্যানুয়াল" শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

একসময় বাংলাদেশ মসলার দেশ নামে পরিচিত ছিল। সমুদ্রপথে এ মসলা যেত ইউরোপ, আমেরিকা, মিশর প্রভৃতি দেশে। সিল্ক রুটের মতো ছিল স্পাইস রুট। ঐতিহ্যের সে ধারায় ভারতবর্ষ এখনও শীর্ষ মসলা উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বে বাংলাদেশে ও হলুদ, মরিচ, আদা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে রয়েছে। পেঁয়াজ ও রসুনের উৎপাদনও ব্যাপক বেড়েছে। কিন্তু অন্যান্য মসলা উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বেশ কম। বাংলাদেশে প্রায় ২০ রকম মসলা সচরাচর জন্মায়। আধুনিক নিয়মে চাষ করে এসব মসলার ফলন বাড়ানো সম্ভব। সেই সাথে বিভিন্ন দেশে রপ্তানির সুযোগও রয়েছে। বাংলাদেশে মোট আবাদি জমির পরিমাণ ৮.৫৯ মিলিয়ন হেক্টর যা মোট জমির ৫৮%। এই আবাদি জমির মাত্র ২.৬% জায়গায় মসলা জাতীয় ফসল সমূহের চাষ হয়। আমাদের আবাদকৃত মসলা ফসলসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জায়গা দখল করে আছে পেঁয়াজ। বাংলাদেশে মসলা ফসলের মধ্যে পেঁয়াজ প্রধান। বাংলাদেশে বর্তমানে মসলাজাতীয় ফসলের মোট প্রয়োজন প্রায় ৩০ লক্ষ মে. টন এর বিপরীতে এদেশে মোট ২৪.৮৮ লাখ মে টন উৎপাদিত হয়ে থাকে। দেশের মোট চাহিদার তুলনায় এ উৎপাদন নিতান্তই অপ্রতুল বিধায় মসলা বাজার হয়ে পড়েছে আমদানি নির্ভর। প্রতিবছর ৫৪টি বিভিন্ন ধরনের মসলা আমদানি করা হয়।

অপরদিকে, বর্তমানে দেশ দানাজাতীয় খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও তেল, চর্বি ও প্রোটিনের পুষ্টিসমৃদ্ধ শস্য বিশেষভাবে তেলজাতীয় ফসল উৎপাদনে অনেকটাই পিছিয়ে আছে, যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা সেটি অর্জনের একটি প্রধান অন্তরায়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, গুণগত মানসম্পন্ন পরিমিত ভোজ্যতেল খাওয়া ব্যতিরেকে পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব নয়, কারণ ভোজ্যতেলে রয়েছে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড যা মানবদেহে তৈরি হয় না। এ ঘাটতি পূরণে ভোজ্যতেল সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সেজন্য দেহকে সুস্থ, সুগঠিত ও রোগ প্রতিরোধে কার্যকর রাখতে নিয়মিত সঠিক পরিমাণ ভালোমানের ভোজ্যতেল গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, মানবদেহে দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৩০% তেল বা চর্বিজাতীয় খাদ্য থেকে আসা উচিত, কিন্তু আমাদের আসে মাত্র ৯% যা নিতান্তই অপ্রতুল। বর্তমানে দেশে ব্যবহৃত ভোজ্যতেলের ৯০% বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এ আমদানি নির্ভরতার ফলে একদিকে যেমন বিদেশে প্রচুর অর্থ চলে যাচ্ছে, তেমনি আমদানি ও বিপণনে মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরতা পণ্যটির বাজারকে প্রায়ই অস্থিতিশীল করছে। এখন সময় এসেছে দেশে তেলের উৎপাদন বাড়িয়ে নিজেদের উৎপাদিত ভেজালমুক্ত তেল ব্যবহার করার।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মসলা জাতীয় ফসলের ঘাটতি পূরণকল্পে "মসলা ও তেলজাতীয় ফসলের জাত পরিচিতি ও উৎপাদন কলাকৌশল ম্যানুয়াল" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশ করতে যাচ্ছে। AFACI-RATES প্রকল্পের মাধ্যমে মসলা ও তেলজাতীয় ফসল প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিসম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশের চাহিদা পূরণে অপরিসীম ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছি। ম্যানুয়ালটি মুদ্রণে অর্থায়নের জন্য কোরিয়ার AFACI কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে ম্যানুয়ালটি প্রণয়নে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা।

বাদল চন্দ্র বিশ্বাস
মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

ভূমিকা

গোটা ভারতবর্ষ একসময় বিশ্বে পরিচিত ছিল 'মসলার দেশ' বা সুগন্ধি গাছের দেশ নামে। আমাদের দেশেও ছিল তার ভেতর। এ উপমহাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি মসলা ও গাছপালা যেত বাইরের দেশে। ইতিহাসে মসলার জন্য যুদ্ধও কম হয়নি। প্রায় ৬০০০ বছর পূর্ব থেকেই এসব গাছের ব্যবহার ও বাণিজ্যের উল্লেখ বিভিন্ন সাহিত্যে পাওয়া যায়। শুধু ভারতীয় উপমহাদেশই নয়, এশিয়া মহাদেশজুড়ে ছিল মসলা ও সুগন্ধি গাছপালার প্রাচুর্য। প্রায় ২৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে জনৈক চীনা সম্রাট শেন নাং চীনে নিয়মিতভাবে সুগন্ধি গাছের বাজার বসাতেন আর কিনতেন নানারকম মসলাসামগ্রী। তিনি প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি মসলা খেতেন সুস্বাস্থ্যের আশায়। চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মায়ানমার প্রভৃতি দেশজুড়ে পাওয়া যেত নানা রকমের সুগন্ধি গাছ। বলাবাহুল্য সেসব গাছের অধিকাংশই সংগৃহীত হতো বনজঙ্গল থেকে। ধীরে ধীরে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক কারণে কিছু বিশেষ বিশেষ সুগন্ধি গাছের চাষ শুরু হয়। এখনো সে চাষাবাদ অব্যাহত আছে, কেউ কেউ বাণিজ্যিকভাবে সুগন্ধি গাছ আবাদ করে অন্যান্য ফসলের চেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন। ইংরেজিতে মসলাকে বলা হয় spice ও সুগন্ধি গাছকে condiments. ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (আইএসও) মসলা ও সুগন্ধি গাছের মধ্যে এখনো সুস্পষ্ট কোনো সীমারেখা টানতে পারেনি। তাই এ দুটিকে এখন একসাথেই spice and condiments নামে ডাকা হয়। আমাদের কাছে সুগন্ধ ছড়ানো সব গাছই মসলা হিসেবে পরিচিত। চাহিদার তুলনায় মসলার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে বাংলাদেশে। অথচ প্রয়োজনের অনেকাংশ মসলাজাতীয় ফসল দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব। উন্নত জাত ও উৎপাদন কৌশলের অপর্যাপ্ত ব্যবহার এবং সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মসলা ফসলের আবাদ।

অধিকাংশ সুগন্ধি মসলা ফসলই এ দেশের জলবায়ুতে রবি তথা শীত মৌসুমে ফলে। তাই রবি মৌসুমে মসলা ও সুগন্ধি ফসল চাষে এখন থেকেই আগাম পরিকল্পনা, পরিকল্পিতভাবে উপযোগী জমি ও এলাকা নির্বাচন, চাষি বাছাই ও প্রশিক্ষণ, উন্নত জাতের বীজ ও উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন শৃঙ্খলা তৈরি ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। বর্তমান সরকার মসলা ফসল আবাদে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করেছে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মসলা ও সুগন্ধি ফসলের আবাদ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। এদেশে আদার গড় জাতীয় ফলন হেক্টরে মাত্র ৫.৫ মেট্রিক টন, হলুদের ২.৬৬ মেট্রিক টন/হেক্টর। অথচ উন্নত জাতের আদা ও হলুদ আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করে হেক্টর প্রতি ২৫ থেকে ৩০ মেট্রিক টন ফলন পাওয়া সম্ভব। এসব কারণে মসলা ও সুগন্ধি ফসলের বর্তমান উৎপাদন এ দেশের চাহিদা মিটানোর জন্যও যথেষ্ট নয়। তাই প্রতিবছর বিদেশ থেকে যেসব সুগন্ধি পণ্য বা দ্রব্য আমদানি করতে হয়। বিদেশ থেকে এ ধরনের যা আসে সেসব পণ্যের মান ও দর্শনমূল্য অনেক বেশি। যদিও দেশী সুগন্ধি পণ্যের স্বাদ ও সুগন্ধ ওসব পণ্যের চেয়ে অনেক বেশি, তথাপি ফলন কম। যুগোপযোগী উচ্চফলা জাত উদ্ভাবন বা প্রবর্তন এখন জরুরি। বিশেষ করে যেসব সুগন্ধি গাছের উচ্চ বাণিজ্য সম্ভাবনা ও চাহিদা রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন AFACI-RATES প্রকল্পের অর্থায়নে "বারি সরিষা-১৮" প্রযুক্তিটি প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়নের ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর সম্প্রসারণ হবে। ফলশ্রুতিতে, সম্প্রসারিত এলাকায় তেল ফসলের চাষাবাদ, ফলন ও উৎপাদনশীলতা আরো বৃদ্ধি পাবে। **"মসলা ও তেলজাতীয় ফসলের জাত পরিচিতি ও উৎপাদন কলাকৌশল ম্যানুয়াল"** ম্যানুয়ালটি প্রকাশের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য জন্য আমি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ। ম্যানুয়ালটি মসলা ও তেলজাতীয় ফসলের আধুনিক জাতসহ উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি, রোগবালাই দমনের আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের ওপর দেশের কৃষক, উৎপাদনকারী,উদ্যোক্তা, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষিবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী, কৃষিবিজ্ঞানী, গবেষক ও এনজিও কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ম্যানুয়ালটি রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও নিরন্তর শুভেচ্ছা।

(রেজওয়ানা রহমান)
উপজেলা কৃষি অফিসার (এল আর)
এবং
কো-পিআই, AFACI-RATES প্রকল্প

Acknowledgement

Asian Food and Agricultural Cooperation Initiative (AFACI), Rural Development Administration (RDA), Republic of Korea is gratefully acknowledged for funding the project Improvement of Rural Agricultural Technology Extension System in Asia (RATES).

বিষয়-সূচি

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	পেঁয়াজ উৎপাদন প্রযুক্তি	১-১২
০২	রসুন উৎপাদন প্রযুক্তি	১৩-১৬
০৩	মরিচ উৎপাদন প্রযুক্তি	১৭-২৫
০৪	আদা উৎপাদন প্রযুক্তি	২৬-৩০
০৫	হলুদ উৎপাদন প্রযুক্তি	৩১-৩৬
০৬	কালোজিরা উৎপাদন প্রযুক্তি	৩৭-৪০
০৭	গোলমরিচ উৎপাদন প্রযুক্তি	৪১-৪৩
০৮	তেজপাতা উৎপাদন প্রযুক্তি	৪৪-৪৬
০৯	দারুচিনি উৎপাদন প্রযুক্তি	৪৭-৪৯
১০	বারি জিরা-১ উৎপাদন প্রযুক্তি	৫০-৫৪
১১	বাংলাদেশে তেলবীজ ফসল উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা, গবেষণা অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৫৬-৬৩
১২	স্বল্পমেয়াদী ও ক্যানোলা জাতীয় সরিষার জাত পরিচিতি ও উৎপাদন কলাকৌশল	৬৪-৬৭
১৩	তেল ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল	৬৮-৭১
১৪	তেল ফসলের প্রধান প্রধান রোগ ও তার প্রতিকার	৭২-৭৭
১৫	তেল ফসলের ক্ষতিকারক পোকা মাকড় ও এদের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা	৭৮-৮১

মসলা জাতীয়
ফসল

খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করে আরও মুখরোচক করে তোলে মসলা। তবে প্রয়োজনীয় চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না মসলার উৎপাদন। অনেক ক্ষেত্রে চাষিদেরও তেমন একটা আগ্রহ নেই মসলা চাষে। এজন্য বিপুল পরিমাণ মসলা প্রতি বছর আমদানিও করতে হচ্ছে। তবে এবার আমদানি কমাতে এবং দেশের মসলার উৎপাদন বাড়াতে গবেষণা ও সম্প্রসারণএর ওপর জোর দিয়েছে সরকার। দেশে মসলার চাষাবাদ বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। দেশের নানা প্রান্তে মসলা চাষের অপার সম্ভাবনা থাকলেও নানা কারণে তার প্রসার হয়নি। এবার সরকারের সহযোগিতায় আরও উন্মুক্ত হচ্ছে মসলার উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনার দুয়ার। উৎপাদন বাড়ানো হলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আমদানিও কমে যাবে এবং অর্থও সাশ্রয় হবে। মসলা কৃষিপণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দিনদিন বাড়ছে জনসংখ্যা, ক্রমেই কমে যাচ্ছে খাদ্যশস্যের জমি। চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে মসলার জমি চলে এসেছে খাদ্যশস্য চাষের আওতায়। এ কারণে মসলার উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ব্যাপকভাবে। চাহিদা মেটাতে বিদেশ থেকে মসলা আমদানি করে এ ঘাটতি পূরণ করা হয়। দেশের কৃষকের মধ্যেও মসলা উৎপাদনে আগ্রহ কমেছে। তুলনামূলক লাভজনক শস্য করার দিকেই ঝোঁক থাকে কৃষকের। প্রধান শস্য উৎপাদনের ফাঁকে উত্তরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে মরিচ ও পেঁয়াজ, আদা চাষ হয়। খোদ রাজধানীর বিভিন্ন বাসার ছাদে উৎপাদন হয় মরিচ। তবে সেটা বাণিজ্যিক না হলেও দেশের অনেক জায়গায় বাণিজ্যিক উৎপাদন হচ্ছে নানা ধরনের মসলার। বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন মসলার দামও পাওয়া যায় ভালো। তবে কৃষকরা অন্যান্য ফসলের সঙ্গে সাথি ফসল হিসেবেই মসলা বেশি চাষ করে থাকেন। নানা প্রচারে কৃষকদের আরও বেশি আগ্রহী করে তোলা গেলে অন্যান্য শস্যের মতো প্রচুর সম্ভাবনারয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশে গত ২০ বছরে মসলার উৎপাদন আটগুণ বাড়লেও তার সঙ্গে বেড়েছে মসলার চাহিদাও। দেশে সারা বছর ব্যবহৃত মসলার ৬০ শতাংশ দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। বাকি ৪০ শতাংশ মসলা আমদানি করতে হয়। দেশে উৎপাদিত মসলার পরিমাণ ৩৫ লাখ টনেরও বেশি। এর পরও ১৪ লাখ টন আমদানি করতে হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪০ থেকে ৪২ শতাংশ মসলার চাহিদা মেটে আমদানির মাধ্যমে। আমদানি মসলার মধ্যে পেঁয়াজ অন্যতম। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে দেশে ২১ হাজার ৬৬২ টন জিরা আমদানি হয়েছিল। যা আগের অর্থবছরে ২০১৫-১৬ এতোই সময়ে দেশে ১৭ হাজার ৬৯২ টন জিরা আমদানি হয়েছিল।

বর্তমান বিশ্বে ১০৯ ধরনের মসলার চাষ করা হলেও বাংলাদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রায় ৫০টি মসলা। এর মধ্যে চাষ করা হয় মাত্র ৩৪টি। দেশে ব্যবহৃত মসলার মধ্যে আদা, হলুদ, মরিচ, রসুন, পেঁয়াজ, কালোজিরা, গোলমরিচ, দারচিনি, জাফরান, তেজপাতা, জিরা, জাউন, শলুক, আলুবোখারা, বিলাতি ধনিয়া, ধনিয়া, চিপস, সাদা এলাচ, কালো এলাচ, মেথি, শাহি জিরা, পার্সলে, কাজুবাদাম, পানবিলাস, দইং, কারিপাতা, পাতা পেঁয়াজ, পেস্তাবাদাম, জায়ফল, জয়ত্রি, লবঙ্গ উল্লেখযোগ্য। কৃষক প্রধান শস্যগুলোর পাশাপাশি মসলা চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে, একই সঙ্গে মোট কৃষি অর্থনীতিকেও এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।এখন পর্যন্ত মসলা কেন্দ্র ১৬টি মসলার ৩৬টি উন্নতজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যেগুলো মাঠপর্যায়ে চাষ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রসুন, পেঁয়াজ, মেথি, ধনিয়া, মৌরি, গোলমরিচ, কালো জিরা, পান, বিলাতি ধনিয়া ও আলুবোখারার বেশকিছু জাত সফলভাবে উদ্ভাবন করেছে মসলা গবেষণা কেন্দ্র।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় ১১৩টি মসলা ফসল চাষ করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির মাত্র ৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ (৪ দশমিক ২০ মিলিয়ন হেক্টর) জমিতে ৩০ ধরনের মসলা ফসল চাষ হয়। এভাবে বাংলাদেশে প্রায় ২৬ দশমিক ৭৩ লাখ টন মসলা উৎপাদিত হয়, যা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৯ শতাংশ। কিন্তু আমরা ৫০টিরও বেশি মসলা ব্যবহার করে থাকি এবং প্রতিবছর ১০ দশমিক ১৫ লাখ টন মসলা বিদেশ থেকে আমদানি করি। দেশের মাথাপিছু মসলা ব্যবহারের হার ৫৪ গ্রাম (বিবিএস, ২০২০)।

আমাদের দেশে দেখা যায় যে, পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, ধনিয়া, হলুদ, কালোজিরা মসলার ব্যবহার বেশি। দেশে প্রতি বছর মসলার চাহিদা ৫৩ দশমিক ৯১ লাখ মেট্রিক টন। এর বিপরীতে উৎপাদিত হচ্ছে ৩৫ দশমিক ৩২ লাখ মেট্রিক টন। ফলে প্রতিবছর মসলার ঘাটতি থেকে যায় ১৮ দশমিক ৫৯ লাখ মেট্রিক টন। উল্লেখ্য, দেশের ৪ দশমিক ২০ লাখ হেক্টর জমিতে এই মসলা চাষ করা হয়। প্রায় ৪০-৪২ শতাংশ পূরণ করা হয় আমদানির মাধ্যমে। ফলে রাষ্ট্রের আমদানি ব্যয় বাড়ে। অন্যান্য খাদ্যপণ্যের তুলনায় বিশ্ববাজারে বেশি ওঠানামা করে মসলার দাম। ঈদ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ঘিরে দেশে বেড়ে যায় মসলার চাহিদাও। বাংলাদেশে মসলার বাজার প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার। আমদানিকৃত মসলার বাজার ৯০০ কোটি টাকার মতো।

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ফসল উৎপাদনের ওপর যে বিশেষভাবে নির্ভরশীল- এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি বাংলাদেশে মসলা ফসলের চাহিদা মেটাতে দেশে মসলা ফসলের চাষ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা গেলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাবে। মসলা ফসলের উচ্চমূল্যের জন্য এগুলো চাষাবাদ লাভজনক। বিভিন্ন ভেষজগুণ থাকায় মসলা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাই মসলার সঠিক ব্যবহার অতিমারি কোভিড, ঠান্ডা, কাশিসহ অন্যান্য রোগ প্রশমনে সাহায্য করবে।

পেঁয়াজ উৎপাদন প্রযুক্তি

ভূমিকা

পেঁয়াজ (Allium cepa L), পরিবার: Alliaceae একটি জনপ্রিয় মসলা ও সবজি। এটি একটি দ্বিবর্ষজীবী শঙ্ককন্দ জাতীয় ফসল। পেঁয়াজের ঝাঁঝ হয়ে থাকে অ্যালাইল প্রপাইল ডাইসালফাইড এর উপস্থিতির কারণে। পেঁয়াজের কন্দ পরিপক্ব হওয়ার সাথে সাথে ঝাঁঝ বাড়তে থাকে। পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনের জন্যফুলের শারীরতাত্ত্বিক গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেঁয়াজের কন্দ এবং বীজ উৎপাদন একটি অপরটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো জেলায় পেঁয়াজের চাষ হয়। তার মধ্যে পাবনা, ফরিদপুর, রাজশাহী, বগুড়া, মানিকগঞ্জ, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর প্রচুর পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপন্ন হয়।

বাংলাদেশে প্রতিবছর পেঁয়াজ বীজের চাহিদা প্রায় ১১০০ টন এবং এর বিপরীতে সরকারি পর্যায়ে ৫-১০ টন এবং বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ৬০-৭০ টন এবং বাকিটা কৃষক নিজে উৎপাদন করে যা পুরোপুরি মানসম্মত নয়। ভালো বীজের জন্য অবশ্যই বীজ উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, বীজের ফলন মূলত জাত, স্থান, মৌসুম ও বীজ উৎপাদন প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশে ২০২০-২১ সালে প্রায় ১.৯৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে ২২.৬৯ লাখ মে. টন পেঁয়াজ উৎপাদিত হয় (বিবিএস, ২০২২)। এদেশে পেঁয়াজের জাতীয় গড় ফলন ১১.৭০ টন/হেক্টর যেখানে বিশ্বব্যাপী গড় ফলন ১৮.৮১ টন/হেক্টর। পেঁয়াজ বীজের গড় ফলন ৪০০-৫০০ কেজি/হেক্টর যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন-ভারত, মিয়ানমার, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, চীন ও কোরিয়ার (১০০০-১২০০ কেজি/হেক্টর) গড় ফলনের চেয়ে অনেক কম।

জলবায়ু

যে সমস্ত স্থানে খুব বেশি ঠান্ডা বা গরম পড়ে না এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয় না, সেসব স্থানে পেঁয়াজ ভালো হয়। যেখানে বছরে ৭৫-১০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় সেসব স্থানে পেঁয়াজ ভাল হয়। দিনের আলো, তাপমাত্রা, মাটির আর্দ্রতা পেঁয়াজের কন্দ গঠন ও ফলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কন্দ সংগ্রহ, কিউরিং ও সংরক্ষণ সময়কালীন উষ্ণ শুষ্ক আবহাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মাটি

সব রকম মাটিতেই পেঁয়াজের চাষ হতে দেখা যায়। তবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত গভীর, ঝুরঝুরে, হালকা দো-আঁশ বা পলিযুক্ত মাটি পেঁয়াজ চাষের পক্ষে সবচেয়ে ভালো। হালকা মাটিতে পরিমিত পরিমাণে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে চাষ করলে পেঁয়াজ বেশ বড় ও ভারী হয়।

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশে ফরিদপুর ভাটি, তাহেরপুরী, কৈলাসনগর, শুকসাগর, ঝিটকা ইত্যাদি স্থানীয় শীতকালীন জাতের পেঁয়াজ চাষাবাদ হয়ে আসছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র হতে বারি পেঁয়াজ-১ (শীতকালীন) এবং বারি পেঁয়াজ-২, ৩ ও ৫ (গ্রীষ্মকালীন), বারি পেঁয়াজ-৪ (শীতকালীন), বারি পেঁয়াজ-৫ (গ্রীষ্মকালীন) ও বারি পেঁয়াজ-৬ (শীতকালীন) নামে মোট ছয়টি জাত মুক্তায়িত হয়েছে।

বারি পেঁয়াজ-১: জাতটি শীত মৌসুমে চাষের উপযোগী। উচ্চ ফলনশীল উন্নতমানের একটি পেঁয়াজ জাত। এর আকার চেপ্টা, গোলাকার, গলা চিকন, মধ্যমাকৃতির, লালচে পাটল বর্ণের এবং অধিক ঝাঁঝযুক্ত। এ জাতটি প্রচলিত স্থানীয় জাত অপেক্ষা উচ্চ ফলনশীল এবং বেশীদিন সংরক্ষণ যোগ্য। গাছের উচ্চতা ৫০-৫৫ সেন্টিমিটার এবং প্রতিটি গাছে ১০-১২ টি পাতা হয়। প্রতিটি শল্ককন্দের ওজন প্রায় ২৫-৪৫ গ্রাম ও কন্দের ব্যাস ৩-৫ সেন্টিমিটার বা ততোধিক হতে পারে। বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্তপ্রায় ১২০-১৪০ দিন সময় লাগে এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ১২-১৬ টন।

বারি পেঁয়াজ-২:

জাতটি বিশেষভাবে খরিফ মৌসুম অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে চাষ উপযোগী স্বল্প সময়ের ফসল। এটি দেখতে গোলাকার এবং রং লালচে বর্ণের। গাছের উচচতা ৩৫-৪৫ সে.মি. এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন ৩৫-৫৫ গ্রাম হয়ে থাকে। তবে রোপণ সময়ের তারতম্য, সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ, অনুকূল আবহাওয়া ও দীর্ঘ দিবস দৈর্ঘ্যে প্রতিটি কন্দের ওজন ৫৫-১৫০ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণতঃ চারা করেই বারি পেঁয়াজ-২ এর চাষ করা হয়। ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা রোপণ করা হয়। আগাম চাষের জন্য মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বপন করা যায় এবং এপ্রিল মাসে ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা মাঠে রোপণ করা যায়। নাবি চাষ এর জন্য বীজ বপণ মধ্য জুন থেকে মধ্য জুলাই মাস এবং চারা রোপণ এর জন্য মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর উপযুক্ত সময়। বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্তপ্রায় ৯৫-১১০ দিন সময় লাগে এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬-১৮ টন।

বারি পেঁয়াজ-৩:

জাতটি বিশেষভাবে খরিফ মৌসুম অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে চাষ উপযোগী স্বল্প সময়ের ফসল। এটি দেখতে গোল আকৃতির এবং রং লালচে বর্ণের। গাছের গড় উচ্চতা ৩৫-৫০ সে.মি. এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন ৪৫-৬৫ গ্রাম হয়ে থাকে। আগাম চাষ এর জন্য মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বপন করা যায় এবং এপ্রিল মাসে ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা মাঠে রোপণ করা যায়। নাবি চাষ এর জন্য মধ্য জুন থেকে মধ্য জুলাই মাসে বীজ বপন এবং মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর মাসে চারারোপণ করা হয়। বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্তপ্রায় ৯০-১০৫ দিন সময় লাগে এবং হেক্টর প্রতি ফলন ১৬-২২ টন।

বারি পেঁয়াজ-৪:

জাতটি শীত মৌসুমে চাষের উপযোগী। উচ্চ ফলনশীল উন্নতমানের একটি পেঁয়াজ জাত। এর আকার গোলাকার ও ঈষৎ লম্বাটে প্রকৃতির এবং গলা সরু ও চিকন, উচ্চ মধ্যমাকৃতির, লালচে বর্ণের এবং মাঝারি ঝাঁঝযুক্ত। এজাতটি প্রচলিত স্থানীয় জাত অপেক্ষা উচ্চ ফলনশীল এবং বেশিদিন সংরক্ষণযোগ্য। প্রতিটি শল্ককন্দের ওজন প্রায় ৬০-৭৫ গ্রাম ও কন্দের ব্যাস ৪-৫ সে.মি. বা ততোধিক হতে পারে। বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত প্রায় ১৪০ - ১৫০ দিন সময় লাগে এবং হেক্টর প্রতি ফলন ১৮-২২ টন।

বারি পেঁয়াজ-৫:

জাতটি বিশেষভাবে আগাম ও নাবি খরিফ মৌসুমে উপযোগী স্বল্প সময়ের ফসল। এটি দেখতে গোলাকার এবং রং লালচে বর্ণের। প্রতিটি কন্দের গড় ওজন প্রায় ৯০-১০০ গ্রাম হয়ে থাকে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬-২২টন। বীজ বপন থেকে কন্দ উত্তোলন পর্যন্ত ১৩৫-১৫০ দিন সময় প্রয়োজন হয়। আগস্টের শেষ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চারা রোপন করলে গাছের উচ্চতা ৬৫-৭৫ সেন্টিমিটার এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন প্রায় ৭০-৮০ গ্রাম হয়।

বারি পেঁয়াজ-৬:

শীত মৌসুমে চাষের উপযোগী, উচ্চ ফলনশীল পেঁয়াজ জাত। গোলাকার, বটম কৌণিক, মধ্যমাকৃতির, লালচে পাটল বর্ণের, অধিক ঝাঁঝযুক্ত এবং ভাজা/বেরেস্তা উপযোগী। শুল্ক কন্দের ওজন প্রায় ৩০-৪৫ গ্রাম ও কন্দের ব্যাস ৩.৫-৫ সেন্টিমিটার। এ জাতটি বারি পেঁয়াজ-১ এর চেয়ে ২০-৩০% বেশি ফলনশীল। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬-২০ টন হেক্টরপ্রতি এবং সাধারণ তাপমাত্রায় ৬-৮ মাস সংরক্ষণ করা যায় ।

জমি তৈরি:

জমি ভালোভাবে প্রস্তুত করা দরকার যাতে মাটি নরম ও ঝুরঝুরে হয়। ৬-৭ মিটার অন্তর অন্তর পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা রাখা দরকার। ভিজা মাটিতে পেঁয়াজে পচন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রস না থাকলে গাছ সন্তোষজনকভাবে বাড়তে পারে না।

সারের পরিমাণ ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি:

হালকা দো-আঁশ মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে চাষ করলে পেঁয়াজ বেশ বড় ও ভারী হয় এবং সেগুলো অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়।

পেঁয়াজ চাষে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হয়ঃ

সার	মোট পরিমাণ কেজি	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা	হিসাবে প্রয়োগ
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি
গোবর	১০ টন	সব	-	-
ইউরিয়া	২৬০ কেজি	৮০ কেজি	৯০ কেজি	৯০ কেজি
টিএসপি	২৬০ কেজি	সব	-	-
এমপিও	১৫০ কেজি	৭৫ কেজি	৩৭.৫ কেজি	৩৭.৫ কেজি
জিংক সালফেট	১১ কেজি	সব	-	-
জিপসাম	১৫০ কেজি	সব	-	-
বোরিক এসিড	১১ কেজি	সব	-	-

মাটির পিএইচ এর মাত্রা ৩ এর নিচে হলে চুন প্রয়োগ করতে হবে। কারণ মাটিতে নিম্ন মাত্রার পি এইচ এর জন্য উৎপাদন মৌসুমে ফসলে পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। পেঁয়াজ উৎপাদন মৌসুমের শুরুতে যদি পি এইচ এর অপর্যাপ্ততা দেখা দেয় তাহলে পুষ্টিজনিত অভাবের কারণে ফলন কম হবে। জমি প্রস্তুত করার ২-৩ দিন পূর্বে পরিমাণমতো চুন প্রয়োগ করতে হবে।

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি ও জিপসাম সমান ভাবে ছিটিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও অর্ধেক এমপি চারা রোপনের ১৫-২০ দিন পর, এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ৩০-৩৫ দিন পর এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও অর্ধেক এমপি ৪৫-৫৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাটি শুকনা হলে ও প্রয়োজনীয় রস না থাকলে সারের উপরি প্রয়োগের পরপরই হালকা সেচ দিতে হবে।

বপন/রোপণ সময়

বাংলাদেশে বর্তমানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে অর্থাৎ রবি ও খরিফ মৌসুমে এমনকি সারা বছরের ফসলরূপে পেঁয়াজের চাষ হয়। দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই বীজতলায় বীজ বুনে, চারা তুলে সেই চারা জমিতে রোপণ করা হয়। সরাসরি ছোট ছোট কন্দ লাগিয়েও পেঁয়াজের চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই এবং বর্ষাকালীন পেঁয়াজ জুলাই থেকে অক্টোবর মাসে চাষ করা যায়। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলেও গ্রীষ্মকালে পেঁয়াজের চাষ করা যায় এবং ফেব্রুয়ারি থেকে মে (মাঘ-বৈশাখ) মাসে চারা লাগানো হয়।

বীজের পরিমাণ

বীজের পরিমাণ প্রতি হেক্টরে ৪-৪.৫ কেজি। অপরদিকে সরাসরি জমিতে বীজ বুনে পেঁয়াজ চাষে হেক্টরপ্রতি প্রায় ৬-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। মুড়িকাটা পেঁয়াজ উৎপাদনের জন্য হেক্টরপ্রতি ২.৫-৫ গ্রাম ওজনের ও ২-৩.৫ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ২.০-৩.৫ টন কন্দের প্রয়োজন।

বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

একটি আদর্শ বীজতলা ৩ মিটারদ্ধ ১ মিটার আকারের হয়ে থাকে। প্রতি বীজতলায় ১৫-২০ গ্রাম হিসেবে পেঁয়াজ বীজ বুনতে হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে চারা উৎপাদনের জন্য ৩ মিটারদ্ধ ১ মিটার আকারের ১২০-১৩০টি বীজতলার প্রয়োজন হয়। এক হেক্টর জমিতে রোপনের উপযুক্ত চারা তৈরি করতে অস্থায়ী বীজতলার জন্য প্রায় ১০০০ বর্গমিটার জমির প্রয়োজন। বীজতলায় ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে আগাছা বেছে মাটি ঝুরঝুরে করা হয়। বীজতলার ওপরে সাদা পলিথিন দিয়ে ঢেকে প্রখর সূর্যালোকে উন্মুক্ত রেখে মৃত্তিকা শোধন করে অথবা বীজতলার উপর ১০ সেন্টিমিটার পুরু করে খড় বিছিয়ে আগুন জ্বালিয়ে শোধন করা যেতে পারে। এরপর প্রতিটি বীজতলা ৫.০ মিটারদ্ধ১.২ মিটার আকারের ৮-১০ সেন্টিমিটার উঁচু করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বীজতলা তৈরি করতে হবে। অথবা প্রত্যেকটি বীজতলায় চারিদিকে যাতায়াত ও পানি নিষ্কাশনের জন্য ৫০ সেন্টিমিটার চওড়া নালা রাখা দরকার। প্রতিটি বীজতলায় ৩-৫ ঝুড়ি পচা গোবর সার ও ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে এবং উপরিভাগে সামান্য কাঠের ছাই ছড়িয়ে বীজতলা প্রস্তুত করতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ২ গ্রাম কার্বেনডাজিম যেমন অটোস্টিন বা প্রভেঙ মিশিয়ে বীজ শোধন করা যায়। এরপর প্রত্যেকটি বীজতলায় ১৫-২৫ গ্রাম বীজ বুনে, ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ১ সেন্টিমিটার পুরু করে ঢেকে দিতে হবে। বীজ বোনার পর হালকা সেচ দিয়ে বীজতলা ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে এবং তারপর প্রয়োজন অনুসারে ১-২ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। বোনার প্রায় ৫-৭ দিন পর বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা বের হয়ে আসে। সাধারণত বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর ১৫-২০ সেন্টিমিটার লম্বা চারা জমিতে রোপণের উপযুক্ত হয়।

বীজতলার পেঁয়াজের বীজ বপনের পর এর আন্তঃপরিচর্যাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বীজ বপনের পরপরই বীজতলার চারিদিকে সেভিন ৮৫ ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে পিঁপড়া বীজ নিয়ে না যায়। এরপর বীজ বপনের ৫-৭ দিনের মধ্যে ডায়াথেন এম-৪৫, ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। বীজ বপনের পর পাটের চট বা বাঁশের চাটাই দিয়ে বীজতলা ৪-৫ দিন ঢেকে রাখতে হবে। এতে বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম সহজ হয়। তবে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চারা তৈরির জন্য বৃষ্টি থেকে চারা রক্ষার উদ্দেশ্যে পলিথিন ব্যবহার করতে হয়। তারপর চট বা চাটাই সরিয়ে ফেলতে হবে। চারা গজানোর ৭-১০ দিনের মধ্যে রোভরাল ২ গ্রাম/লিটার অথবা এমিস্টারটপ পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। পরবর্তীতে অটোস্টিন ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ১২-১৫ দিনের মধ্যে স্প্রে করতে হবে। চারা ছোট অবস্থায় বীজতলায় প্রচুর আগাছা জন্মে এবং উক্ত আগাছাসমূহ পরিষ্কার করে নিয়মিত সেচ দিতে হবে।

বপন/রোপণ পদ্ধতি

পেঁয়াজ সাধারণত তিনভাবে জমিতে লাগানো হয়। যথা-

ক) বীজতলায় চারা তৈরি করার পর পেঁয়াজের আগা কেটে জমিতে রোপণ করা।

খ) ছোট আকারের পেঁয়াজের কন্দ সরাসরি জমিতে রোপণ করা।

গ) সরাসরি বীজ বপন করা।

অধিক ফলন ও বড় আকারের পেঁয়াজ পেতে হলে বীজতলায় চারা উৎপাদন করে সেচ সুবিধাযুক্ত স্থানে সেই চারা রোপণ করতে হবে। ছোট আকারের (২-৫ গ্রাম) পেঁয়াজের কন্দ রোপণ করলে কম সময়ে মাঝারি ধরনের ফলন পাওয়া যায় কিন্তু বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না।

চারা নির্বাচন

বীজতলা থেকে চারা উত্তোলন ও জমিতে রোপণের জন্য চারা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুস্থ, সবল, সতেজ চারা নির্বাচন করে মূল ও আগা/ডগা সামান্য ছেঁটে নিতে হয়। চারা উত্তোলনের পূর্বে বীজতলায় হালকা সেচ দিতে হয় যেন চারা সহজেই উঠে আসে।

চারা রোপণ

পেঁয়াজের জন্য প্রস্তুতকৃত জমিকে সেচের জন্য মাঝে মাঝে নালা রেখে ছোট ছোট ব্লকে ভাগ করা হয়। প্রতি ব্লকে ১০-১৫ সেন্টিমিটার দূরে সারি করে, প্রতি সারিতে ৫-০৭ সেন্টিমিটার অন্তর চারা রোপন করা যায়। চারা রোপণের পরপর হালকা সেচ দিতে হয়। চারা অবস্থায় কন্দ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হলে সেই চারা রোপণ করা যাবে না অর্থাৎ বেশি বয়সি চারা রোপণ করলে ফলন খুবই কম হবে।

কন্দ লাগানোর পদ্ধতি

সাধারণত খরিফ-২ মৌসুমের শেষ দিকে মুড়ি কাটা পেঁয়াজ উৎপাদনের জন্য পেঁয়াজের ছোট ছোট কন্দ লাগিয়ে পেঁয়াজের চাষ করা যায়। ১০-১৫ সেন্টিমিটার দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ৫-৭ সেন্টিমিটার দূরত্বে পেঁয়াজের কন্দ লাগানো হয় । কন্দ লাগানোর পরই জমিতে সেচ দেওয়া আবশ্যক। ৫-৭ দিনের মধ্যেই চারা বের হয়ে আসে। বড় আকারের পেঁয়াজ লাগালে গাছে তাড়াতাড়ি ফুল ধরে এবং ফলন কম হয়। সাধারণত পূর্ববর্তী বছরের নির্ধারিত ছোট কন্দই বীজ হিসেবে লাগানো হয়।

পেঁয়াজের কন্দ রোপণ

কলি উৎপাদনের জন্য মাঝারি ও বড় আকারের কন্দ লাগানো যেতে পারে এবং লাগানোর ৩৫-৮০ দিন পর্যন্ত পাতা ও কলি তোলা যায় যা সাধারণত কৃষক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী চাষ করে থাকে ।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

পেঁয়াজ রোপণ এবং সেচের পর জমিতে জন্মানো আগাছা জমির রস ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে। এইজন্য প্রথম অবস্থায় ২-৩ বার বা ততোধিক নিড়ানি দিয়ে জমি আলগা করে আগাছামুক্ত রাখা দরকার। এতে কন্দ ভালোভাবে গঠিত হয় ও ফলন বাড়ে ।

সেচ

পেঁয়াজ চাষের জন্য পরিমিত মাত্রায় সেচের গুরুত্ব অপরিসীম। সেচ সাধারণত বৃষ্টিপাত, বোনার সময়, মাটির অবস্থা ও চারা বা কন্দের ওপর নির্ভর করে। পেঁয়াজের জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা থাকা প্রয়োজন রয়েছে। পেঁয়াজের জীবনচক্রে হেক্টরপ্রতি ২৫০ মিলি লিটার পানির প্রয়োজন, এ জন্য ৪ থেকে ৬ বার সেচ দিতে হবে। শীতকালীন পেঁয়াজের তুলনায় গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজে অপেক্ষাকৃত বেশি সেচের প্রয়োজন। তেমনি এঁটেল মাটির থেকে হালকা মাটিতে বেশি সেচের প্রয়োজন হয়। চারা মাটিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ৪-৫ দিন অন্তর সেচ দেওয়া প্রয়োজন । কন্দ গঠিত হয়ে গেলে সেচ কম লাগে এবং পেঁয়াজ পরিপক্ব হলে ফসল উঠানোর এক মাস পূর্বে সেচ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত এবং না করলে গুণাগুণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। পেঁয়াজ ফসল দীর্ঘদিন সেচ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে হঠাৎ করে সেচ দিলে কন্দের শল্কপত্র ফেটে যেতে পারে এবং বাজারমূল্য কমে যায়। তাই সবসময় যেন জমিতে জো থাকে সে ব্যবস্থা করা দরকার।

সংগ্রহ সময়

পেঁয়াজ পরিপক্ব হলে পাতা ক্রমশ বাদামি হয়ে যায় এবং পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে ভেঙে পড়ে। যখন ৫০-৬০% পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে নেতিয়ে পড়ে তখনই পেঁয়াজ তোলার উপযুক্ত সময়। সাধারণত রোপণের ৯০ থেকে ১১০ দিনের মধ্যে শীতকালীন পেঁয়াজ উত্তোলনের উপযুক্ত হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে শীতকালীন পেঁয়াজ এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন পেঁয়াজ রোপণের ৬০-৭০ দিন পর যথাক্রমে জুন-জুলাই ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে উত্তোলন করা হয়।

পেঁয়াজ সংরক্ষণ

ভালোভাবে পরিপক্বতার পর উজ্জ্বল রৌদ্রযুক্ত দিনে পেঁয়াজ সংগ্রহ করে, পাতা ও শিকড় কেটে ৫-৭ দিন বায়ু চলাচলে সুবিধাযুক্ত শীতল ও ছায়াযুক্ত স্থানে Curing করে নিতে হয়। ভালো কন্দগুলো যথাযথভাবে বাছাই করে শুষ্ক, ঠান্ডা ও বায়ু চলাচলের উপযুক্ত জায়গায় বাঁশের মাচা তৈরি করে ৬-৮ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া ঘরের সিলিং প্লাস্টিক বা বাঁশের র‍্যাক অথবা ঘরের পাকা মেঝেতে রেখে সংরক্ষণ করা যায়। গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজে পানির পরিমাণ বেশি থাকে

বিধায় শীতকালীন পেঁয়াজের তুলনায় সংরক্ষণ ক্ষমতা কম। পেঁয়াজ সংরক্ষণ উল্লেখ্য যে, ছোট কন্দ বিশিষ্ট পেঁয়াজ বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায়। মাঝে মাঝে সংরক্ষিত পেঁয়াজ উল্টেপাল্টে দিতে হবে এবং পচা পেঁয়াজ বাছাই করতে হবে। বৃষ্টির দিনে বিশেষভাবে পেঁয়াজের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা বেশি হওয়ায় পেঁয়াজ শুকায় না, যার ফলে পেঁয়াজ পচতে শুরু করে। এ অবস্থায় প্রয়োজনে পেঁয়াজ মাচা থেকে নামিয়ে ছায়ামুক্ত স্থানে পাতলা করে বিছিয়ে শুকিয়ে নিয়ে মাচায় উঠাতে হবে।

ফলন

সঠিক সময়ে বীজ বোনা ও চারা রোপণ, বীজ হিসেবে কন্দ অথবা আদর্শ চারা নির্বাচন, জাত, সেচ ও সার প্রয়োগ, মাটির প্রকৃতি, উত্তোলনের সময় ইত্যাদির ওপর পেঁয়াজের ফলন নির্ভর করে। কন্দ রোপণ করে চাষ করা থেকে পেঁয়াজের চারা রোপণ করলে ২০-২৫ শতাংশ ফলন বেশি হয়।

পেঁয়াজ কন্দ থেকে পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন

বীজের ফলন বীজ উৎপাদন কৌশলের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পেঁয়াজ এর বীজ সরাসরি বীজ থেকে বীজ এবং কন্দ থেকে বীজ উৎপাদন দুটোই প্রচলিত। তবে উন্নত ও অধিক ফলনের জন্য কন্দ থেকে বীজ উৎপাদন পদ্ধতিটি সবচেয়ে উপযোগী হওয়ায় দেশে সাধারণত কন্দ থেকে বীজ উৎপাদন পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়। পরপরাগী ফসল হওয়ায় জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে এক জাত থেকে অন্য জাতের স্বতন্ত্রীকরণ দূরত্ব (৪০০-১০০০ মিটার) বজায় রাখা প্রয়োজন । ভালোভাবে পরাগায়নের জন্য জমির চারিদিকে বা আইলের ভিতরে সরিষা, ধনিয়া, মৌরী, কালো জিরা, জোয়ান প্রভৃতি পতঙ্গ (মৌমাছি ও মাছি পোকা) আকর্ষী ফসলের চাষ করা যেতে পারে। উৎপাদন পদ্ধতির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল-

মাতৃকন্দ সংরক্ষণ

উত্তোলনের পর পাতা ও শিকড় কেটে ৭-১০ দিন বায়ু চলাচল সুবিধাযুক্ত শীতল ও ছায়াময় স্থানে কিউরিং করতে হবে। তারপর বাছাই ও শ্রেণীবিন্যাস করে শুষ্ক, ঠান্ডা ও বায়ুময় গুদামে সংরক্ষণ করতে হয় ।

মাতৃকন্দ রোপণের পূর্ব পর্যন্ত আলো বাতাসময় স্থানে মাচা তৈরি করে ৬-১২ ইঞ্চি উচ্চতায় পেঁয়াজ ছড়িয়ে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। পচা বা শুকনা পেঁয়াজ বেছে সরিয়ে ফেলতে হয় ।

মাতৃকন্দ নির্বাচন

সম্ভাব্য বড় আকারের সুস্থ, পরিপক্ব ও রোগমুক্ত পেঁয়াজের মাতৃকন্দ নির্বাচন করা প্রয়োজন।

পেঁয়াজ ছোট হলে গাছ দুর্বল হয়, ফুলদণ্ড চিকন ও হালকা হয় এবং সহজেই ভেঙে পড়ে। কদম (Umbel) ছোট হয়, ফুল কম ধরে এবং বীজের ফলন কম হয়।

জাতভেদে ১৫-২৫ গ্রাম ওজনের কন্দ এবং তার ব্যাস ২.৫-৩.৫ সেমি.হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি বীজ উৎপন্ন করে। বড় ও মধ্যম আকারের মাতৃকন্দ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ বীজ উৎপাদিত হলেও বীজের খরচ বেড়ে যায়। তবে অঙ্কুরিত মাতৃকন্দ বীজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা ঠিক নয়।

সার ও সেচ প্রয়োগ

পেঁয়াজ বীজ ফসলের সময়কাল ১৫০-১৬৫ দিন। সেজন্য বীজ উৎপাদনে সারের প্রয়োজন অনেক বেশি। যথেষ্ট পরিমাণ জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। সুষ্ঠু নীরোগ বীজ উৎপাদনে মুখ্য ও গৌণ উভয় প্রকার সার প্রয়োগ আবশ্যক।

হেক্টরপ্রতি পেঁয়াজ বীজ ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণঃ

সার	মোট পরিমাণ (কেজি)	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ ১ম কিস্তি	পরবর্তী ২য় কিস্তি	পরিচর্যা হিসাবে ৩য় কিস্তি	প্রয়োগ ১ম কিস্তি
গোবর	১০ টন	১০ টন	২০-২৫ দিন	৪০-৪৫ দিন	৬৫-৭০ দিন
টিএসপি	৪১৫ কেজি	৪১৫ কেজি	-	-	-
এমপি	২৭০ কেজি	৯০ কেজি	৯০ কেজি	৯০ কেজি	-
ইউরিয়া	৩২০ কেজি	৮৫ কেজি	৮০ কেজি	৮৫ কেজি	৮০ কেজি
জিপসাম	১৪০ কেজি	১৪০ কেজি	-	-	-
জিংক অক্সাইড	১০ কেজি	১০ কেজি	-	-	-
বোরন	৫ কেজি	৫ কেজি	-	-	-

- জমিতে শেষ চাষের পূর্বে উল্লিখিত পরিমাণে বিভিন্ন রাসায়নিক সার ছিটিয়ে দিতে হবে।
- ১ম কিস্তির সার গাছের বয়স ২৫-৩০ দিন, ২য় কিস্তি ৫০-৫৫ দিন এবং ৩য় কিস্তি ৭৫-৮০ দিন পর উল্লিখিত পরিমাণমতো প্রয়োগ করতে হবে।
- উপরি সার প্রয়োগের পর পানি সেচ অত্যাবশ্যক। বীজ উৎপাদনের জন্য ২০ দিন পরপর পরিমাণমতো পানি সেচ প্রয়োগে ভালো ফলন পাওয়া যায় ।

মাতৃকন্দ রোপণের সময় ও পদ্ধতি

- পেঁয়াজ রোপণ সময়ের ওপর বীজ উৎপাদনের প্রভাব রয়েছে। বেশি আগাম রোপণে ফুলদণ্ডেফুলের সংখ্যা কম হয়। নাবিতে রোপণে গাছের বৃদ্ধি কম হয়, ফুল কম আসে এবং পার্পল ব্লচ রোগ ও থ্রিপস পোকার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, তাছাড়া বিলম্বে রোপণ করলে সেসব বীজ ফসল কালবৈশাখী ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ হতে মধ্য নভেম্বর মাস পর্যন্ত পেঁয়াজের মাতৃকন্দ রোপণের উপযুক্ত সময় ।
- সারি হতে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সেমি. এবং কন্দ থেকে কন্দের দূরত্ব ১৫ সেমি, হওয়া ভালো ।
- নির্দিষ্ট দূরত্বে ছোট লাঙল অথবা রডের টানা দ্বারা ৫-৬ সে.মি. গভীর নালা টেনে উক্ত নালায় ৪-৫ সেমি. গভীরে পেঁয়াজের মাতৃকন্দ রোপণ করে পার্শ্ববর্তী মাটি দ্বারা মাতৃকন্দ ঢেকে দেওয়া আবশ্যক ।

মাতৃকন্দ বীজের পরিমাণ

- বীজ উৎপাদনের জন্য জাতভেদে আমাদের দেশে এক হেক্টর জমিতে ২০০০-৩৫০০ কেজি মাতৃকন্দের প্রয়োজন হয়।

মাতৃকন্দ বীজের পরিমাণ

- বীজ উৎপাদনের জন্য জাতভেদে আমাদের দেশে এক হেক্টর জমিতে ২০০০-৩৫০০ কেজি মাতৃকন্দের প্রয়োজন হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

- বীজ উৎপাদনের মৌসুমে বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। তাই জমির অবস্থা দেখে পানি সেচ দেওয়া প্রয়োজন। ফুল আসা পর্যায়ে অবশ্যই পানি সেচ দিতে হবে। তবে গাছের গোড়ায় যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- প্রত্যেক কিস্তিতে সার প্রয়োগের পর পানি সেচ দেওয়া দরকার। সেচের পর মাটির জো দেখে নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে। আগাছা পরিষ্কারের সময় গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

- পেঁয়াজের পুষ্পদণ্ড যাতে বাতাসে ভেঙে না পড়ে, সেজন্য বাঁশের খুঁটি ও নাইলনের দড়ি দিয়ে স্টেকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

বৈরী আবহাওয়ার প্রভাব এবং সম্ভাব্য ক্ষতি ও প্রতিকার

- বৈরীপ্রকৃতি যেমন টানা শৈত্যপ্রবাহ, ঘন কুয়াশা এবং ফ্রিজিং লেবেলের স্বাভাবিকতা অনেকসময় নিচে নেমে আসে, ঘন কুয়াশার কারণে সূর্যতাপ বিকরিত হতে না পারায় শীতের প্রচণ্ডতা বেড়ে যায়। এজন্য দেশের মধ্যাঞ্চলে পেঁয়াজ বীজ ফসলের আবাদ করা ভালো ।
- মার্চ-এপ্রিলের শিলাবৃষ্টি ও কালবৈশাখী ঝড়ে পেঁয়াজ বীজ ফসলের ক্ষতি হয়। এজন্য যেসব এলাকায় আগাম শিলাবৃষ্টি বেশি হয় সে এলাকা বাদে এবং জমির চতুর্দিকে ভুট্টা, অড়হড় ইত্যাদি গাছ লাগানো যায়। শিলাবৃষ্টি ও কালবৈশাখী ঝড় এড়াতে যথাসম্ভব আগাম চাষ করা প্রয়োজন।

পেঁয়াজের রোগবালাই

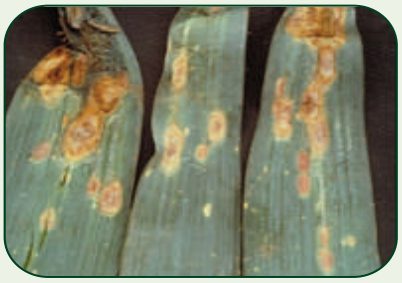

পেঁয়াজের উৎপাদন কম হওয়ার জন্য রোগবালাই একটি প্রধান কারণ। পেঁয়াজের প্রধান প্রধান রোগ ও তার দমন ব্যবস্থা নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

পার্পল ব্লচ (Purpole Blotch) অলটারনারিয়া পোরি (Alternaria porri) নামক ছত্রাক দ্বারা এই রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত বীজ, বায়ু ও গাছের পরিত্যক্ত অংশের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকে। এই রোগের আক্রমণেপ্রাথমিক পর্যায়ে গাছের পাতা বা পুষ্পদণ্ডে ছোট ছোট পানি ভেজা দাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে দাগগুলো ধীরে ধীরে বড় হয়। অনুকূল আবহাওয়ায় প্রতি পাতা বা পুষ্পদণ্ডে এক বা একাধিক দাগ পড়ে এবং তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দাগের মধ্যবর্তী অংশ লালচে বাদামি রং ধারণ করে। পরবর্তীতে দাগের মধ্যবর্তী অংশ কালো বর্ণ ধারণ করে এবং দাগের কিনারায় বেগুনি রং দেখা যায়। দাগের মধ্যস্থ গাঢ় অংশ ছত্রাকের বীজ কণা দিয়ে পূর্ণ থাকে। সাধারণত আক্রান্ত পাতা ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে হলুদ হয়ে মরে যায়। পুষ্পদণ্ড ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হলে তা ভেঙে পড়ে। বীজ পেঁয়াজ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে পারে না এবং এতে বীজ উৎপাদন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।

দমন

- সুস্থ ও নীরোগ বীজ ও চারা ব্যবহার করতে হবে।
- আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।
- কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-অটোস্টিন) অথবা কার্বোক্সিন + থিরাম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউপি)প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।
- জমিতে রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ইপ্রোডিয়ন গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা ডাইফেনোকোনাজল + অ্যাজোক্সিস্ট্রবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-এমিস্টার টপ ৩২৫ এসসি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ৩-৪ বার গাছে স্প্রে করতে হবে। বীজ পেঁয়াজের ক্ষেত্রে একই ছত্রাকনাশক একই পরিমাণে ১০ দিন পরপর ৫-৬ বার স্প্রে করতে হবে।

কন্দ পচা (Bulb rot)

স্কেলেরোসিয়া রল্ফসি (Sclerotium rolfsii) ও ফিউজেরিয়াম (Fusarium Sp.) নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। ছত্রাক দুটি প্রধানত মাটিবাহিত মাটির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ও যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা থাকলে এ রোগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। পানি সেচের মাধ্যমে আক্রান্ত ফসলের জমি হতে সুস্থ ফসলের মাঠে বিস্তার লাভ করে। স্কেলেরোসিয়া রলফসি দ্বারা আক্রান্ত গাছ হাত দিয়ে টান দিলে পেঁয়াজসহ খুব সহজেই মাটি থেকে উঠে আসে। আক্রান্ত স্থানে ছত্রাক জীবাণু সরিষার দানার মতো বাদামি রঙের গোলাকার স্কেলেরোসিয়া দেখা যায়। ফিউজেরিয়াম দ্বারা আক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং টান দিলে সহজেই উঠে আসে না। উভয় জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কাণ্ডে পচন ধরে এবং আক্রান্ত কন্দ গুদামজাত করলে সংরক্ষিত অন্যান্য সুস্থ কন্দও সংক্রমিত হয়।

দমন

- সুস্থ বীজ ও চারা রোপণ করা প্রয়োজন।
- প্রোভ্যাক্স ২০০ (কার্বক্সিন + থিরাম) নামক ছত্রাকবারক কেজিপ্রতি ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- পানি নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ।
- আক্রান্ত জমিতে প্রতিবছর পেঁয়াজ চাষ না করে অন্য ফসলের সঙ্গে শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।
- জমিতে রোগ দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-অটোস্টিন) অথবা কার্বোক্সি + থিরাম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউপি) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ৩-৪ বার গাছের গোড়ায় মাটিতে স্প্রে করতে হবে।

পচন রোগ

- পেঁয়াজের সুস্থকন্দ সংরক্ষণ করা।
- সংরক্ষণাগারে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন ।
- সংরক্ষণের স্থানটি পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া আবশ্যক ।
- মাঝে মাঝে রোগাক্রান্ত কন্দ বেছে বাদ দিতে হবে।

পোকামাকড়

থ্রিপস পোকা

আক্রান্ত পাতা রূপালি রং এর অথবা পাতায় ক্ষুদ্রাকৃতির বাদামি দাগ বা ফোটা দেখা যাবে। পাতা শুকিয়ে বিকৃত হতে পারে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলে পাতা ঝরে যায় এবং কন্দের আকার ছোট ও বিকৃত হয়। থ্রিপসের আক্রমণে ৫০% পর্যন্ত ফসলের ক্ষতি হতে পারে।

দমন

- সাবান মিশ্রিত পানি ৪ গ্রাম/লিটার হারে প্রয়োগ করলে থ্রিপস পোকার আক্রমণ কম হয়।
- কন্দ উৎপাদনের ক্ষেত্রে শীতের শেষে যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সাকসেস, ইমিটাফ, কেরাতে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।

বীজ সংগ্রহ, শুকানো ও সংরক্ষণ

- শতকরা ২০-৩০ ভাগ কদমের মুখ ফেটে কালো বীজ দেখার পর সংগ্রহ করা প্রয়োজন। একই সময়ে পেঁয়াজের সব ফুলদণ্ডের বীজ পরিপক্ব হয় না ফলে ৩-৪ বারে শুধুমাত্র পাকা কদম বা পুষ্পমঞ্জুরিগুলো তুলে নিতে হয়।
- মানসম্পন্ন উচ্চ ফলনের খরিফ পিঁয়াজের বীজ পাওয়ার লক্ষ্যে কদম (আম্বেল) এর শতকরা ১৫-২০ ভাগ ফল (ক্যাপসুল) ফেটে কালো বীজ দেখা গেলে উক্ত কদম কাঁচি দিয়ে ফুলদণ্ডের কদমের নিচ থেকে ৫-১০ সেমি. অংশসহ কেটে সংগ্রহ করতে হবে। বীজ সংগ্রহের সময় বৃষ্টিতে যাতে না ভেজে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।
- আম্বেল বা পুষ্প মঞ্জুরিগুলো বস্তা বা বড় গামলা বা বালতিতে করে সংগ্রহ করে মাড়াইখোলায় (থ্রেসিং ফ্লোর) বা উঠানে বা ত্রিপল বা সিমেন্টের ফ্লোরের ওপর রোদে শুকাতে হবে। বীজ কখনই পলিথিনের উপর শুকানো যাবে না, এতে বীজের গায়ে জলীয় বাষ্প জমা হয়ে সমস্ত বীজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
- শুকনা আম্বেলগুলো চটের ওপর রেখে হালকাভাবে ঘষে বা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মাড়াই করে ও ঝেড়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়।
- পরিষ্কার করা বীজ ৪-৫ দিন কাপড় বা চটের ওপর বিছিয়ে রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, বায়ুনিরোধ পলিথিন ব্যাগে সিল করে টিন অথবা প্লাস্টিকের পাত্রে ভরে শুকনা জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত। সরাসরি সিমেন্টের ওপর বা টিনের পত্রে বীজ শুকানো উচিত নয়। এতে বীজ ঝলসে যেতে পারে ।
- মেঘমুক্ত প্রখর রোদে বীজ ৪-৫ দিন শুকানো হলেই বীজের আর্দ্রতা ৬-৮% এর মধ্যে বজায় থাকবে। ৬% আর্দ্রতাসম্পন্ন বীজ বায়ুনিরোধক পাত্রে রেখেও এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় ।
- অনার্দ্র অথবা হিমায়নযন্ত্রে গুদামজাত করলে বীজের সজীবতা ও গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে । নিম্ন (০-৪° সে.) তাপমাত্রায় (রেফ্রিজারেটরে) দুই বছর পর্যন্ত পেঁয়াজ বীজ ভালো থাকে ।

রসুন উৎপাদন প্রযুক্তি

ভূমিকা বাংলাদেশে রসুন (Allium sativa L), পরিবার: Alliaceae একটি অতীব গুরুত্বপুর্ণ মসলা ফসল। রসুনের চাষ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বি-বর্ষজীবী শুল্ককন্দ জাতীয় অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে রসুনের চাষ সাধারণত রবি মৌসুমে সীমাবদ্ধ। এটি রান্নার স্বাদ, গন্ধ ও রুচি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বিধায় শাক-সবজি, মাংস প্রভৃতি রান্নার এবং আচার, চাটনি প্রস্তুতে রসুন ব্যবহৃত হয়। পুষ্টিগুণ ছাড়াও রসুন অনেক ঔষধিগুণে গুণান্বিত। ২০২০-২০২১ সালে ১০.৭৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৫.০২ লক্ষ মেট্রিক টন রসুন উৎপাদিত হয় (বিবিএস, ২০২২) এবং ফসল সংগ্রহোত্তর পরবর্তী ক্ষতি প্রায় ২৫-৩৫% অর্থাৎ ১.৬৩-২.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মসলা গবেষণা কেন্দ্র থেকে রসুনের ৪টি জাত (বারি রসুন-১, ২,৩ ও ৪) উ ড্ডাবিত হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় জাতের কিছু রসুনের চাষাবাদ হয়।

বারি রসুন-১:

গাছের উচ্চতা ৬০-৬২ সেন্টিমিটার, প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ৭-৮টি, প্রতি কন্দে কোয়ার সংখ্যা ২০-২২টি, কোয়ার দৈর্ঘ্য ২-২.৫ সেন্টিমিটার, কোয়ার ব্যাস ১-১.৫ সেন্টিমিটার, কন্দের ওজন ১৯-২০ গ্রাম পর্যন্ত হয়। কোয়া রোপণ থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ১৪০-১৫০ দিন সময় লাগে। এ জাতটি ভাইরাস ও অন্যান্য রোগে কম আক্রান্ত হয় ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো । গড় ফলন ৬-৭ টন।

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মসলা গবেষণা কেন্দ্র থেকে রসুনের ৪টি জাত (বারি রসুন-১, ২,৩ ও ৪) উদ্ভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় জাতের কিছু রসুনের চাষাবাদ হয়।

বারি রসুন-২:

এ জাতের গাছের উচ্চতা ৫৬-৫৮ সেন্টিমিটার, প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ৯-১০টি, প্রতি কন্দে কোয়ার সংখ্যা ২৩-২৪টি। কোয়ার দৈর্ঘ্য ২.৫-৩.০ সেন্টিমিটার, কোয়ার ব্যাস ২-২.৫ সেন্টিমিটার, কন্দের ওজন ২২-২৩ গ্রাম পর্যন্ত হয়। কোয়া রোপণ থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ১৪৫-১৫৫ দিন সময় লাগে। রসুনের আগা ঝলসানো বা টিপবার্ন হয় না বললেই চলে। এ জাতটি ভাইরাস ও অন্যান্য রোগে কম আক্রান্ত হয় ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো। গড় ফলন ৮-৯ টন।

বারি রসুন-৩:

কোয়ার আকৃতি ২.৫০ × ০.৯০ সেন্টিমিটার, কন্দের আকৃতি ৩.৩৯ × ৩.০ সেন্টিমিটার, কন্দের ওজন গড়ে ১১.০-১২.৪৩ গ্রাম। কোয়া রোপণ থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ১৩৫-১৪০ দিন সময়ের প্রয়োজন হয়। এ জাতটি ভাইরাস ও অন্যান্য রোগে কম আক্রান্ত হয়। সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো। রসুনের আগা ঝলসানো বা টিপবার্ন হয় না বললেই চলে। গড় ফলন ১০.০-১১.৩১ টন ।

বারি রসুন-৪:

কোয়ার আকৃতি ২.২০ × ০.৮০ সেন্টিমিটার, কন্দের আকৃতি ২.৯৭ × ২.৫০ সেন্টিমিটার, কন্দের ওজন গড়ে ১০.০-১০.৬২ গ্রাম কোয়া রোপণ থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ১৩০-১৪০ দিন সময় লাগে। এ জাতটিতে ভাইরাস কম আক্রান্ত হয়। গড় ফলন ৮.০-৯.০ টন।

মাটি ও আবহাওয়া

পানি নিকাশের ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটিতে রসুন ভালো জন্মে। জমিতে পানি নিকাশের সুব্যবস্থা না থাকলে কন্দ বড় হয় না এবং রসুনের রং খারাপ হয়ে যায়। অম্লমান ৫.৫-৬.৮ ভালো ফলন পাওয়া যায়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে রসুন ভালো জন্মে। রসুন গাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য ঠান্ডা আবহাওয়া এবং বাল্ব পরিপক্ক হওয়ার জন্য দীর্ঘ দিবস ও শুষ্ক আবহাওয়ার প্রয়োজন। তাপমাত্রা বেশি হলে রসুনের কোয়া দানা বাঁধতে পারে না। রসুন লাগানোর পর অতিরিক্ত গরম, মেঘলা আবহাওয়া বাবেশিবৃষ্টিপাত হলে কন্দ ভলোভাবে গঠিত হয় না। অধিক বৃষ্টিপাত ও কুয়াশাচছন্ন আবহাওয়ায় রোগবালাই ও পোকামাকড় এর আনাগোনা বৃদ্ধি পায় যা কন্দ উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। রবি মৌসুমে রসুনের কন্দ উৎপাদনের জন্য তাপমাত্রা ১৫-১৭ক্ক সেন্ট্রিগ্রেড এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০% হলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। কোয়ার ভ্রূণ বৃদ্ধির জন্য ৫-১০ক্ক সে. এবং পরিপক্বতার জন্য ২০-২৫ক্ক সে. এর তাপমাত্রা প্রয়োজন ।

রোপণ সময়

অনুকূল আবহাওয়ায় বাংলাদেশে সর্বত্র শীতকালে রসুনের চাষ করা হয়। সাধারণতঃ সমতল ভূমিতে ১৫ই অক্টোবর-১৫ই নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রহায়ণ) মাসে রসুনের চাষ হয় ।

রোপণ পদ্ধতি

ক) ডিবলিং পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে নরম মাটিতে সুতা দিয়ে লাইন করে কোয়া মাটিতে রোপণ করতে হয়।
খ) ফারো (নালা) রোপণ পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে সুনিষ্কাশিত জৈব পদার্থসমৃদ্ধ চাষকৃত দো-আঁশ মাটিতে লাঙল দিয়ে সোজা নালা তৈরি করে কোয়া রোপণ করা হয়। ফারো রোপণ পদ্ধতি রসুন চাষের জন্য ভালো। একটি আদর্শ ৪ মিটার লম্বা এবং ১.৫ মিটার প্রস্থের তৈরিকৃত ব্লকে রো-কোদাল দিয়ে ২.৫-৩.০ সে.মি গভীর নালা করে তার মধ্যে ৮-১০ সে.মি. দূরে দূরে রসুনের কোয়া রোপণ করতে হবে। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব হবে ১০ সেন্টিমিটার।

জমি তেরি

ফারো (নালা) রোপণ পদ্ধতি

রসুনের জমি ৬-৭টি চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে প্রস্তুত করা দরকার। পূর্ববর্তী ফসল তোলার চাষ ও মই দিয়ে আগাছা বেছে ও ঢেলা ভেঙে মাটি ঝুরঝুরে করা হয় ।

বিনা চাষে রসুন উৎপাদন

বন্যাপ্লাবিত এলাকায় বন্যার পানি নেমে গেলে জমির আগাছা পরিষ্কার করে রসুনের কোয়া রোপণ করা হয়। পরবর্তীতে ধানের খড় দিয়ে মালচিং করা হয়। সেচের প্রয়োজন হলে সেচ দেওয়া হয়। এভাবে বিনা চাষে রসুন উৎপাদন করা যায়।

বীজ হার

রসুনের কোয়া বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রসুনের কন্দ থেকে কোয়া পৃথক করা হয়। পূর্ববর্তী বছরের উৎকৃষ্ট ফসল থেকে বড় বড় কন্দ বেছে বীজের জন্য রাখা উচিত। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে ০.৭৫- ১.০ গ্রাম ওজনের রসুনের কোয়া বীজ হিসেবে ব্যবহার করলে বেশি ফলন ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হওয়া যায়। কোয়ার আকার অনুযায়ী হেক্টর প্রতি ৫০০-৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বীজ রোপণের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ৩-৪ গ্রাম সিকিউর/রোভরাল/অটোস্টিন মিশিয়ে বীজ শোধন করা যায়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

ফলন বেশি পেতে হলে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে। জৈবসার প্রয়োগে ফলন বেশি হয়। রসুনের জন্য প্রতি হেক্টরে নিম্নোক্ত সার প্রয়োগ করতে হবে ।

সার	মোট পরিমাণ (কেজি)	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা	হিসাবে প্রয়োগ
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি
গোবর	৫ টন	সব	-	-
ছাই	১০-১২ কেজি (প্রতি শতাংশে)	সব	-	-
টিএসপি	৩৬৭ কেজি	সব	-	-
এমওপি	৩৩৩ কেজি	১৬৭ কেজি	৮৩ কেজি	৮৩ কেজি
ইউরিয়া	২১৭ কেজি	১০৯ কেজি	৫৪ কেজি	৫৪ কেজি
জিপসাম	১১০ কেজি	সব	-	-
জিঙ্ক অক্সাইড	৫ কেজি	৫ কেজি	-	-
বোরিক এসিড	৪ কেজি	৪ কেজি	-	-

সম্পূর্ণ গোবর, টি এস পি, জিপসাম এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি জমি তৈরির সময় দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি দুই কিস্তিতে সমানভাবে রসুন রোপণের ২৫ দিন এবং ৫০ দিন পর দিতে হবে। এছাড়া জমিতে ছাই প্রয়োগ করলে মাটি আলগা থাকে এবং ফলন বেশি হয় ।

আন্তঃপরিচর্যা

রসুনের চারা যখন বড় হতে থাকে, তখন জমিতে আগাছা জন্মাতে পারে। কন্দ গঠনের আগ পর্যন্ত ২-৩টি নিড়ানি দিয়ে, আগাছা পরিষ্কার ও মাটি আলগা করে দিতে হবে। রসুনের জমিতে এমনভাবে নিড়ানি দেওয়া প্রয়োজন, যাতে শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। প্রতিবারই ক্ষেতে নিড়ানির পর ঝুরঝুরা মাটি দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হবে। জমিতে ৪-৫ সেন্টিমিটার পুরু করে কচুরিপানা বা ধানের খড় দ্বারা মালচ প্রয়োগ করলে রসুনের ফলন ভালো হয়। এইক্ষেত্রে বেশি সেচের প্রয়োজন হয় না।

সেচ

রসুনের কোয়া বোনার পর একবার সেচ দেওয়া হয়। চারা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ১০-১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। রসুনের জমিতে বিশেষ করে কন্দ গঠনের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্দ্রতা থাকা প্রয়োজন। যখন মাটির রস স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয় তখন ফলন কমতে থাকে। রসুনের খেতে মাটির চটা বাঁধা কন্দের বৃদ্ধির পরিপন্থি। পানি সেচের পর মাটির জো আসার সাথে সাথে চটা ভেঙে দিতে হবে। রসুন গাছ কোনো অবস্থাতে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না, তাই জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে। সেচ প্রয়োগের এক ঘণ্টা পর সেচ নালা খুলে দিতে হবে যাতে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যেতে পারে। পানি সেচ অবশ্যই ফসল উত্তোলনের তিন সপ্তাহ পূর্বে থেকে বন্ধ রাখতে হবে।

রোগবালাই

রসুনের রোগবালাইয়ের মধ্যে পার্পল ব্লচ, ঢলে পড়া এবং পাতা ঝলসানো রোগ অন্যতম। পাতা ঝলসানো রোগের ফলে পাতার উপর ছোট ছোট সাদাটে গোল দাগ দেখা যায়। ফলে পাতা প্রথমে হলদে ও পরে বাদামি রং ধারণ করে ঝলসে শুকিয়ে যায়। অনেক সময় পটাশিয়ামের অভাবে রসুনের পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে (Tip Burn) যায়।

দমন

- বোর্দোমিক্সার (তুঁতে : চুন : পানি = ১ : ১ : ১০০) বা ডাইথেন এম-৪৫/রোভরাল ২ গ্রাম/ মেত্রপোজের ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পরপর ৩-৪ বার স্প্রে করে দমন করা যায়।

- পটাশের অভাবজনিত ডগা শুকিয়ে যাওয়া রোগ প্রতিরোধে মূল সারের পাশাপাশি অতিরিক্ত পটাশ সার পরবর্তীতে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

রসুনের স্প্লিটিং (Garlic splitting / Garlic secondary sprouting)

এটি একটি Physiological disorder। ফসলে অতিরিক্ত ইউরিয়া সার প্রয়োগ এবং সংগ্রহের পূর্বে বৃষ্টিপাত হলে বা সেচ প্রদান করলে এই সমস্যা দেখা যায়। জমিতে রসুন গাছে এবং উত্তোলনের পর বাল্বের কোয়াগুলো আলাদা হয়ে অঙ্কুরোদ্গমের মাধ্যমে নতুন গাছের জন্ম হয়।

দমন

- পরিমিত মাত্রায় নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহার করতে হবে।
- ফসল তোলার কমপক্ষে ১ মাস আগে সেচ বন্ধ করতে হবে।

পোকামাকড়

রসুন সাধারণত থ্রিপস/চুষি পোকা, রেড স্পাইডার ও মাইট দ্বারা আক্রান্ত হয়। থ্রিপস পাতার রস চুষে খাওয়ার কারণে পাতায় প্রথমে সাদা দাগ দেখা যায়। পরে পাতার অগ্রভাগ বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায় এবং পাতা নলের আকার ধারণ করে। রসুন সংরক্ষণকালে সিগারেট বিটল, লেপিডপটেরা বোরার ও ব্লাক/শুটি মোল্ডদ্বারা আক্রান্ত হয়।

দমন

- কেরাট/টাফগর/এডমায়ার/গেইন/সাকসেস/মোভেন্টো প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটারে হারে স্প্রে করে সহজেই দমন করা যায়।
- সংরক্ষণাগারে/ফসটক্সি/ফিউমিগেন্ট দিয়ে সংরক্ষণকালীন পোকামাকড় দমন করা যায়। এছাড়াও উত্তম পরিপক্ব রসুন গাছসহ কিউরিং করে বেনি বেঁধে সংরক্ষণ করলে রসুনের ক্ষতি কম হয়।

ফসল সংগ্রহ

রসুন রোপণের দুই মাস পর থেকে কন্দ গঠিত হতে থাকে। তিন থেকে সাড়ে তিন মাস পরে কন্দ পুষ্ট হতে শুরু করে। ৪-৫ মাস পরে রসুন উত্তোলন করা যায়। পাতার অগ্রভাগ হলদে বা বাদামী হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকলে বুঝতে হবে রসুন পরিপক্ব হয়েছে। এক্ষেত্রে কন্দের বাহিরের দিকের কোয়াগুলো পুষ্ট হয়ে লম্বালম্বিভাবে ফুলে ওঠে এবং দুটি কোয়ার মাঝে খাঁজ দেখা যায় । এটি রসুন তোলার উপযুক্ত সময়। গাছ হাত দিয়ে টেনে তুলে মাটি ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর কন্দগুলি ৩-৪ দিন ছায়ায় রেখে শুকানোর পর গাছ দিয়ে বেনি বেঁধে গুদামজাত করতে হবে।

গুদামজাতকরণ

শুকনা রসুন সহজে আলো বাতাস চলাচল করে এমন ঘরের ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এতে রসুন সবচেয়ে ভাল থাকে। এছাড়া হিমাগারে শূন্য থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং শতকরা ৬০-৭০ ভাগ আর্দ্রতায় রসুন ভালোভাবে বেশি দিন রাখা যায়।

মরিচ উৎপাদন প্রযুক্তি

ভূমিকা

মরিচ (Capsicum frutescens) পরিবার: Solanaceae একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দৈনন্দিন রান্নায় রং, রুচি ও স্বাদে ভিন্নতা আনার জন্য মরিচ একটি অপরিহার্য উপাদান। মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও মরিচে পুষ্টির প্রায় সব উপাদান উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদ্যমান। পুষ্টিমানে কাঁচা মরিচ ভিটামিন এ ও সি সমৃদ্ধ । প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁচা মরিচে-আমিষ ২-৩ গ্রাম, শ্বেতসার ৬ গ্রাম, তৈল ০.৬ গ্রাম, আঁশ ৭ গ্রাম, ক্যারোটিন ১০০-২০০০০ আই,ইউ, ভিটামিন সি-২০-২৮০ মি.গ্রাম এবং অন্যান্য ভিটামিন ও পানি রয়েছে। ক্যাপসাইসিন নামক রাসায়নিক পদার্থের জন্য মরিচ ঝাঁঝালো হয়। ক্যাপসানথিন নামক একটি রঞ্জক পদার্থের জন্য মরিচ উজ্জ্বল ও লাল বর্ণের হয়। মরিচের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন, দেশে ২০২০-২১ সালে রবি ও খরিফ মৌসুমে মরিচের মোট আবাদি জমির পরিমাণ প্রায় ১.০০ লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন ৪.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন।

বাংলাদেশে দুই ধরনের মরিচ চাষ করা হয়:

১। কম ঝাল বা ঝালবিহীন (Capsicum annum): সবুজ সবজি, আচার এবং সালাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
২। ঝাল মরিচ (Capsicum frutescence): মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র হতে বারি মরিচ-১ ও বারি মরিচ-২ (গ্রীষ্মকালীন), মরিচ-৩ (শীতকালীন) এবং বারি মরিচ-৪ (শীতকালীন) নামে ৪টি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। নতুন উন্নত মুক্তায়িত জাত এবং অন্যান্য দেশি জাতগুলোর মান খুব ভালো। স্থানীয় জাতগুলোর মধ্যে বালিঝুড়ি, বিন্দু, ইরি মরিচ, মিঠা মরিচ, বাওয়া, তরনী, দিঘলা, টেঙ্গাখালি, হলেন্দার, গোলমরিচ, আলমডাঙ্গা মরিচ, মাঠউবদা, হালদা ইত্যাদি। নিম্নে উদ্ভাবিত জাতসমূহের পরিচিতি বর্ণনা করা হলো ।

জাতসমূহের বৈশিষ্ট্য

বারি মরিচ-১:

এ জাতটি সারা বছর চাষের উপযোগী। উচ্চতা ৩০-৩৫ সেমি পার্শ্ব বিস্তৃতিতে ৫৫-৬০ সেমি । গাঢ় ঘন সবুজ পাতায় পরিবেষ্টিত ।গাছ ঝোপালো হওয়ায় বাহির থেকে কাঁচা মরিচ দেখা যায় না। তাই অনিষ্টকারী পাখির উপদ্রব কম হয়। প্রতি গাছে ৭০০-৭৫০টি মরিচ ধরে। কাঁচা মরিচ লম্বায় ৫.৫-৬.৫ সে.মি. এবং ব্যাসে ২.৫-৩.৫ সেমি। মরিচের ত্বক পুরু। মরিচ পাকা অবস্থায় চকচকে লাল। কাঁচা এবং পাকা মরিচের ঝাল সহনশীল। প্রতিটি পাকা মরিচে ৭০ ৭৫টি বীজ থাকে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১০-১২ টন কাঁচা মরিচ এবং ২.৫-৩ টন শুকনা মরিচ উৎপাদন হয়। ভাসমান বেডে চাষ করার জন্য এ জাতটি খুবই উপযোগী।

বারি মরিচ ২:

এই জাতটির গাছ লম্বা ও ঝোপালো। এর উচ্চতা ৮০-১১০ সেমি। গাছের পাতার রং হালকা সবুজ। প্রধানত গ্রীষ্মকালে চাষ হয়ে থাকে। জাতটিতে পোকামাকড়ের আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম। কাঁচা অবস্থায় মরিচের রং হালকা সবুজ এবং পরিপক্ব অবস্থায় লাল রং এর হয়ে থাকে। কাঁচা মরিচ সংগ্রহের পর ৫-৭ দিন পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহার উপযোগী থাকে। এ জাতের মরিচের জীবনকাল ২৪০ দিন (মার্চ-অক্টোবর), প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৭টি, প্রতি গাছে মরিচের সংখ্যা ৪৫০-৫০০টি (ওজন ১১০০ গ্রাম), প্রতিটি মরিচের ফলের দৈর্ঘ্য ৭.০-৭.৫ সে.মি. ও ওজন ২.৫ গ্রাম, ১০০০ বীজের ওজন ৪.৫ গ্রাম। হেক্টর প্রতি কাঁচা মরিচের ফলন ২০-২২ টন। এই জাতের মরিচ কিছুটা জলাবদ্ধতা সহনশীল।

বারি মরিচ ৩:

এটি প্রধানত শীতকালীন জাত। গাছের উচ্চতা ৭৫-৮০ সে.মি.। গাছের পাতার রং সবুজ। গাছ মাঝারি।

সচরাচর গুদামজাত অবস্থায় পেঁয়াজের পচন দেখা যায়। এগুলো হলো নরম পচা (Erwinia Sp.), কালো পচন (Aspergillus niger.), শুকনা পচা (Fusarium Sp.) রোগ ।

দমন

ধরনের ঝোপালো এবং শাখান্বিত। কাঁচা অবস্থায় মরিচের রং হালকা সবুজ এবং পরিপক্ব অবস্থায় উজ্জ্বল, চকচকে এবং লাল রং বিশিষ্ট । প্রতি গাছে পাকা মরিচের সংখ্যা ৬০-৭০টি (ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম), প্রতিটি মরিচের ফলের দৈর্ঘ্য ১০-১২ সে.মি. ও ওজন ৩ গ্রাম, ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৫ গ্রাম। পাকা অবস্থায় জাতটির হেক্টরপ্রতি ফলন প্রায় ৮-১০ টন।

বারি মরিচ-৪:

এটি শীতকালে চাষ উপযোগী জাত। জাতটি চরাঞ্চলসহ কমবেশি সারা দেশে চাষ করা সম্ভব। গাছ লম্বা, ঝোপালো ও প্রচুর শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। গাছ লম্বায় ৮০-১০০ সেমি. এবং পাতার রঙ সবুজ। প্রতি মরিচের ফলের দৈর্ঘ্য ১০.০-১২.০ সেমি., ওজন গড়ে ১.৮-২.০ গ্রাম। ১০০০ বীজের ওজন ৪.৫-৫.০ গ্রাম। প্রতি গাছে মরিচের সংখ্যা ৪৮০-৫২০টি এবং ওজন ১২০০-১৪০০ গ্রাম। এই জাতের গাছের মরিচের ত্বক পাতলা । এই জাতটি মাঠে ১৪০-১৫০ দিন পর্যন্ত (নভেম্বর-মার্চ) থাকে। তুলনামূলকভাবে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। কচি অবস্থায় ফল সবুজ রঙের এবং পাকা অবস্থায় চকচকে লাল রঙের হয়। হেক্টরপ্রতি টোপা মরিচের (Red Ripe Chilli) ফলন ১৪-১৬ টন। শুকনা মরিচ ৩.৫-৪.০ টন। এছাড়াও অর্নামেন্টাল মরিচ-১ ও অর্নামেন্টাল মরিচ-২ নামে আরো দুইটি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে।

মাটি

পানি নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত বেলে দো-আঁশ থেকে এটেল দো-আঁশ মাটিতে মরিচ চাষ করা হয়। তবে জৈব পদার্থসমৃদ্ধ উর্বর দো-আঁশ মাটি চাষাবাদের জন্য উত্তম। সব মাটিতে মরিচের চাষ করা গেলেও ক্ষারীয় মাটিতে ফলন ভালো হয় না। মাটির পিএইচ ৬.০ থেকে ৭.০ হলে মরিচের উৎপাদন ভালো হয়। বন্যাবিধৌত পলি এলাকায় মাঝারি ও উঁচু ভিটা যেখানে বর্ষার পর ভাদ্র (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে জো অবস্থা আসে, সেখানে মরিচ ভালো হয় ।

উৎপাদন মৌসুম

- রবি মৌসুম: বীজ বপনের সময় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
- খরিফ মৌসুম: বীজ বপনের সময় ডিসেম্বর- ফেব্রুয়ারি

বপণ পদ্ধতি

আমাদের দেশে দুইভাবে জমিতে মরিচ লাগানো হয় - ১. সরাসরি বীজ বপন ২. বীজতলায় চারা তৈরি করে পরে জমিতে রোপণ।

মাটি ও বীজ শোধন

বীজতলার মাটির ওপর ৩-৪ সেন্টিমিটার ধানের খড়ের স্তর তৈরি করে পুড়িয়ে মাটি শোধন করতে হবে। বপনের পূর্বে অটোস্টিন (২ গ্রাম/কেজি বীজ) দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

বীজ হার

- ছিটিয়ে বপন করলে ২.৫-৩.০ কেজি/হে.
- চারা উৎপাদন করে ১.০-১.৫ কেজি/হে.

বীজতলায় বীজ বপন

মাটির লেভেল হতে ১ সেমি গভীরে বীজ বপন করতে হয়। ৫-৭ দিনের মধ্যে বীজ গজানোর পর চারা ৩-৪ সেমি লম্বা হলে অতিরিক্ত চারা পাতলা করতে হবে।

চারার পরিচর্যা

বীজ বপনের পর বীজতলায় বীজ যাতে পোকামাকড় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সেভিন মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। বাঁশের চাটাই বা পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিতে হবে। চারা তৈরি হলে ইনসেক্ট প্রুফ নেট দিয়ে চারা ঢেকে দিতে হবে। বীজ বোনার পর চারা বের না হওয়া পর্যন্ত নেটের ওপর ঝর্ণা দিয়ে সেচ দেওয়া আবশ্যক । বীজতলায় আগাছা জন্মালে ১-২ বার নিড়ানি দিয়ে আগাছা বেছে মাটি আলগা করে দিলে চারা ভালো হয়। চারা তোলার আগের দিন বীজতলায় সেচ দিলে মাটি নরম হয়। এতে শিকড়ের ক্ষতি না করে সহজেই চারা তোলা যায় এবং চারা সহজেই জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে জমিতে লাগানোর উপযোগী হয়। খাট, মোটা কাণ্ড ও ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট চারা রোপণের জন্য উপযুক্ত। চারা রোপণের পরপর জমিতে পানি সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে মাটিতে সহজে গাছ নিজকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

জমি চাষ ও ভিটি তৈরি

মাটির প্রকারভেদে জমিতে ৪-৬টি চাষ দিতে হয়। প্রথম চাষে জমি গভীরভাবে চাষ হওয়া দরকার। শেষ চাষের সময় সুপারিশকৃত মাত্রায় গোবর, টিএসপি, জিপসাম এবং প্রায় ১/৩ অংশ মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। জমিতে ১ মিটার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের ভিটি তৈরি করতে হবে। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার্থে প্রত্যেক ভিটি অন্তত ২০ সেমি উঁচু হবে ও দুই ভিটির মাঝে ৩০ সেমি. প্রশস্থ নালা থাকবে। প্রত্যেক ভিটির উভয় পার্শ্ব হতে ৩০ সে.মি. চওড়া নালা থাকবে। প্রত্যেক ভিটায় দুই সারি চারা লাগানোর পর উভয় পার্শ্ব ২৫ সেমি জায়গা খালি থাকবে ।

চারা রোপণ দূরত্ব

খরিপ মৌসুম ৫০×৫০ সে.মি. দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে। রবি মৌসুম ৫০দ্ধ২৫ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সার	মোট পরিমাণ (কেজি)	শেষ চাষের সময় দেয়	পরবর্ত কিস্তি (কেজি)		
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
গোবর	১০ টন	সব	-	-	-
টিএসপি	২৬০ কেজি	৪০ কেজি	৬০ কেজি	৮০ কেজি	৮০ কেজি
এমপি	৩৩০ কেজি	সব	-	-	-
ইউরিয়া	২৪০ কেজি	৬০ কেজি	৫০ কেজি	৬৫ কেজি	৬৫ কেজি
জিপসাম	১৫০ কেজি	সব	-	-	-
জিঙ্ক অক্সাইড	১২ কেজি	১২ কেজি	-	-	-
বোরিক এসিড	১৪ কেজি	১৪ কেজি	-	-	-

হরমোন প্রয়োগ

ফ্লোরা নামে এক প্রকার হরমোন প্রয়োগে দেখা গেছে মরিচের ফুল কম ঝরে এবং ফলন বাড়ে। এক মিলিলিটার ফ্লোরা ৪.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে সমস্ত গাছের ওপর ছিটিয়ে দিতে হবে। ফুল আসলে প্রথমবার এবং ২০-২৫ দিন পর দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করতে হবে। এক হেক্টর জমিতে প্রায় ৫০০ লিটার হরমোনের প্রয়োজন হয় ।

আন্তঃপরিচর্যা

নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটি ঝুরঝুরা করতে হয়। চারার সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য শুষ্ক মৌসুমে সেচের খুবই প্রয়োজন। সেচের প্রয়োজনীয় মাটির পানি ধারণক্ষমতা ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। সেচের কয়েক দিন পর মাটিতে চটা দেখা দিলে এই চটা ভেঙে দিতে হবে, যাতে শিকড় প্রয়োজনীয় আলো ও বাতাস পায় যা গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।

বীজ উৎপাদন

মরিচ স্ব-পরাগায়িত ফসল কিন্তু শতকরা ৯০ ভাগ মরিচ পর-পরাগায়িত হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু জাতে পর-পরাগায়ন হতে পারে। মানসম্মত বীজ উৎপাদন করতে হলে বীজ ফসল আলাদা করে লাগাতে হবে। মরিচের স্বাতন্ত্রীকরণ দূরত্ব অন্তত ৪০০ মিটার হতে হবে। স্ব-পরাগায়নের জন্য সাদা পলিথিন ব্যাগ দিয়ে ফুল পরাগধানী বিদারণের আগেই ঢেকে দিতে হবে। পরিপক্ব, পুষ্ট এবং উজ্জ্বল লাল রঙের মরিচ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সাধারণত একটি মরিচে ৭০-৭৫টি বীজ থাকে এবং ১০০০টি বীজের ওজন প্রায় ৫ গ্রাম। বীজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কলাকৌশল অনুসরণ করলে প্রতি হেক্টরে ৮০-৮৫ কেজি বীজ উৎপাদন করা সম্ভব ।

ফসল সংগ্রহ

মরিচ কাঁচা অথবা পাকা অবস্থায় তোলা হয়। চারা লাগানোর ৩৫-৪০ দিন পর গাছে ফুল ধরতে শুরু করে, ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে ফল ধরে ৭৫ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে আরম্ভ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের সংগৃহীত ফসল কাঁচা মরিচ হিসেবে এবং পরের মরিচ পাকা (লাল রং) হিসেবে সংগ্রহ করা হয় । সবুজ, চকচকে, মসৃণ ত্বক এবং মাঝারি ঝাঁঝের কাঁচা মরিচের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। অন্যদিকে লম্বা, উজ্জল লাল বর্ণ, চকচকে, পাতলা মসৃন ত্বক এবং বেশি ঝাঁঝ পাকা মরিচ (যা পরবর্তীতে শুকানো হয়) মসলা হিসেবে অধিক জনপ্রিয়। মরিচের ফুল ফোঁটা, ফল ধরা, রং ধারণ ইত্যাদি তাপমাত্রা, মাটির উর্বরতা এবং উন্নত জাতের ওপর নির্ভর করে। উষ্ণ তাপমাত্রায় ফল তাড়াতাড়ি পাকে এবং ঠান্ডায় পাকতে দেরি হয়। অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে এর স্বাভাবিক উৎপাদন কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে পারে। মরিচ সাধারণত ৩-৮ পর্যায়ে তুলতে হয় । কাঁচা ফল বড় ও পুষ্ট দেখে তুলতে হয়। প্রতি সপ্তাহে পাকা ফল সংগ্রহ করা যায়। শুকনা মরিচের জন্য আধাপাকা মরিচ তুললে মরিচের রং ও গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। ফলগুলো সাধারণত অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা, ছায়াযুক্ত, এবং শুকনো জায়গায় ২৮ক্ক সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ৬০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করলে ১-২ সপ্তাহে কোনোক্ষতি হয় না ।

মরিচ শুকানো

পাকা মরিচ শক্ত মাটির উপরে বা পাকা মেঝে বা টিনের চালে অথবা পাকা বাড়ির ছাদে ৫-৮ সেন্টিমিটার পুরু করে বিছিয়ে সূর্যের আলোতে শুকানো হয়। তবে গবেষণায় দেখা গেছে যে, সরাসরি সূর্যের আলো মরিচে "হোয়াইট প্যাচ" সৃষ্টি করে যা মরিচের গুণগত মান নষ্ট করে। সাধারণত ২২-২৫ক্ক সেলসিয়াস তাপমাত্রা মরিচ শুকানোর জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। সব মরিচের রং সমভাবে ঠিক রেখে শুকানোর জন্য এবং যাতে মোল্ড/ছত্রাক জন্মাতে না পারে সেজন্য মাঝে মাঝেই রৌদ্রের মধ্যে মরিচ নেড়ে দিতে হবে। ভালভাবে না শুকালে মরিচের রঙ, ঝাঁঝ এবং চকচকে ভাব নষ্ট হয়ে যায়। ভালো বীজ, উচ্চ অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা, উজ্জ্বল রং ও উন্নত পুষ্টিমান, অণুজীবের আক্রমণ এবং আফলাটক্সিন এর হাত হতে মরিচকে রক্ষার জন্য শুকনো মরিচের আর্দ্রতা ৮-১০% মধ্যে রাখতে হবে। শুকানোর সময় রোগে আক্রান্ত এবং রং নষ্ট হয়ে যাওয়া মরিচ বেছে ফেলে দিতে হবে। সাধারণত ১০০ কেজি কাঁচা মরিচ শুকিয়ে ২৫-৩৫ কেজি (১ কেজি পাকা মরিচ শুকালে ২৫০-৩০০ গ্রাম) শুকনো মরিচ পাওয়া যায়। সোলার ড্রায়ার এর সাহায্যেও মরিচ শুকানো যায়। ৮ ফুট লম্বা ৪ ফুট চওড়া এবং ৪ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট হার্ডবোর্ড, কাঁচ ও তারের জাল দিয়ে দুই স্তর বিশিষ্ট সোলার ড্রায়ার তৈরি করে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে মরিচ শুকানো যায়। এতে মরিচের রং ভালো থাকে।

সংরক্ষণ

কাঁচা মরিচ ০ক্ক সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং ৯৫-৯৮% আর্দ্রতায় ৫০-৬০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। আবার ৭-১০০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও ৯০-৯৫% আর্দ্রতায় ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। দূরবর্তী স্থানে কাঁচা মরিচ পরিবহণের ক্ষেত্রে ছিদ্রযুক্ত বাঁশের ঝুড়ি এবং পাটের ব্যাগ ব্যবহার করলে মরিচ ভালো থাকে। মরিচ শুকানোর পরে ছায়াযুক্ত স্থানে ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করতে হবে। দ্বিস্তর বিশিষ্ট পলিথিন ব্যাগ ও টিনের পাত্রের মধ্যে পলিথিন দিয়ে তার ভিতর মরিচ রাখলে মরিচের রং ও গুণগত মান খুব ভালো থাকে । সংরক্ষিত মরিচ মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিলে ভালো থাকে। মরিচ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মরিচের বোঁটা যেন মরিচ থেকে পৃথক না হয়ে যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বোঁটা মরিচ থেকে পৃথক হয়ে গেলে মরিচের বীজ মরিচের পড় হতে পড়ে যায়। ফলে মরিচের ওজন ও ঝাঁঝ দুইই কমে যায়।

মরিচ উৎপাদনের সমস্যা

শীতকালীন মরিচ চাষে উপযুক্ত জমির সংকট। কেননা উক্ত মৌসুমে বেশিরভাগ জমি ভুট্টা, আলু, সবজি ইত্যাদি ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বলে মরিচের আওতায় জমি বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। মরিচ চাষে উচ্চ ফলনশীল জাত, মানসম্পন্ন বীজ এবং উন্নত বিধায় প্রযুক্তির ব্যবহারের অভাব দেখা যায়।

রোগবালাই সমস্যা

মরিচ চাষে প্রধান অন্তরায় হলো মরিচের বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস রোগ। এসব রোগের মধ্যে যেমন- মোজাইক ভাইরাস, লিফ কার্ল, ব্যাকটেরিয়াল স্পট, অ্যানথ্রাকনোজ, ফিউজারিয়াম উইল্ট, পচন রোগ ইত্যাদি প্রধান সমস্যা। এছাড়া বর্তমানে নেমাটেড ও মরিচ চাষে সমস্যা।

ঢলে পড়া রোগ

কচি চারাতে এ রোগ হতে পারে। এ রোগে ৩-৭ দিনে আক্রান্ত গাছের মাটি সংলগ্ন গোড়া কালো হয়ে পচে যায়। গাছ ঢলে পড়ে ও মরে যায়।

দমন

- অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে মরিচ চাষ করতে হবে।
- প্রতি কেজি বীজের জন্য প্রোভেক্স-২০০ অথবা অটোস্টিন ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।
- সম্ভব হলে ফরমালিন দ্বারা মাটি শোধন করতে হবে।
- জমিতে চুন প্রয়োগ করতে হবে ।
- জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে পটাশ সার প্রয়োগ করলে রোগ অনেক কম হয় ।
- রোগমুক্ত বীজতলার চারা লাগাতে হবে ।
- রোগাক্রান্ত গাছ তুলে এবং ফসল সংগ্রহের পর পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- শিকড় গিঁট কৃমি দমন করতে হবে কারণ ইহারা ছত্রাকের অনুপ্রবেশে সাহায্য করে।
- অটোস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছের গোড়ার মাটিতে স্প্রে করতে হবে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত ফল পঁচা

গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া, বৃষ্টির ছটা, পোকা ও উদ্ভিদের রোগাক্রান্ত অংশের মাধ্যমে ছড়ায়। কাণ্ডের নিকট থেকে প্রথমে ছোট নরম পচা দাগের সৃষ্টি হয়। এই নরম পচা দাগগুলো খুব দ্রুত ফলে আক্রমণ করে। ফলের ভিতরের অংশ খুব নরম মনে হয়। আক্রমণের কিছুদিনের মধ্য পানি ভেজা দাগ দেখা যায়। পরে সম্পূর্ণ ফল পচে যায়। ফলকে দেখতে পানিতে ভর্তি থলের মতে দেখা যায়। ফলের ত্বক ফেটে পানি ফলের ভিতর হতে বের হয়ে গেলে ফল শুকিয়ে যায়।

দমন

- সুস্থ ও রোগমুক্ত গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে ।
- আক্রান্ত লতা-পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।
- শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।
- ১ লিটার পানির মধ্যে ৩ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড (কুপ্রাভিট) মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে ।
- প্রাথমিক অবস্থায় ১ লিটার পানির মধ্যে সানভিট (কপার অক্সিক্লোরাইড) ৫ গ্রাম মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর গাছে স্প্রে করতে হবে।

ফল পচা (Collectotrichum capsici)

বীজের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। ফুল আসার সময় আলাদা আলাদাভাবে ফুলে আক্রমণ করে এবং ফল শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত স্থান থেকে কাণ্ডেও ছড়ায়। আক্রান্ত কাণ্ডের বাকল প্রথমে বাদামি রং ধারণ করে পরে উজ্জ্বল সাদা রঙের হয়।

মরিচের ফল পচা রোগ দমন

- সুস্থ ও সবল ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রোভেক্স -২০০ বা অটোস্টিন (প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম) দ্বারা বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।
- পানি নিকাশের সুব্যবস্থা করতে হবে।
- গাছের পরিত্যক্ত অংশ, আগাছা ও আশেপাশের ধুতুরা জাতীয় গাছ একত্র করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে প্রতি লিটার পানিতে টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

ব্যাকটরিয়াল লিফস্পট (Xanthomonos vesicatoria)

প্রাথমিক অবস্থায় পাতার উপরে বাদামী রঙের দাগ পড়ে। আক্রান্ত পাতায় রোগ বেশি হলে পাতা হলুদ রঙ ধারণ করে ও ঝরে পড়ে। কাণ্ডে আক্রান্ত হলে ঢলে পড়ে।

মরিচের লিফস্পট রোগ

দমন

- সুস্থ ও রোগমুক্ত গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- নিড়ানির সময় যেন গাছ ক্ষত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।
- আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ফেলতে হবে।
- এক লিটার পানির মধ্যে ৩ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড (কুপ্রাভিট) মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে ।
- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এক লিটার পানিতে সানভিট বা কুপ্রাভিট ৭ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছে ৭-১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

Scirtothris dorsalis ফসল চক্র

মাটিবাহিত রোগের প্রতি মরিচ অত্যন্ত সংবেদনশীল। এইজন্য একই জমিতে বছরে একবারের বেশি মরিচ বা সোলানেসী পরিবারভুক্ত অন্য কোনো ফসল চাষ করা যাবে না। বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অবশ্যই অনুসরণ-করতে হবে।

পোকামাকড়

মরিচ চাষে পোকামাকড়ের উপদ্রব রোগের চেয়েবেশি থ্রিপস/চুঙ্গি পোকা Thrips palmi গাছের যেকোনো অবস্থায় এ পোকার আক্রমণ হয়। তবে ফুল ফোটার সময়ই বেশি ক্ষতি করে। এই পোকা পাতার রস চুষে খায়। ফলে পাতা কুকড়ে যায়। আক্রান্ত গাছ বা পাতা তামাটে রঙ ধারণ করে।

দমন

প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি টাফগর/এডমায়ার মিশিয়ে স্প্রে করলে দমন করা যায়।

মাকড়/মাইটস (Polyphagotarsonemus latus)

আক্রান্ত পাতা কুকড়ে নিচের দিকে নেতিয়ে পড়ে।কচি পাতায়ও এ পোকা আক্রমণ করে। আক্রান্ত গাছ গাঢ় সবুজ রঙ ধারণ করে। আক্রান্ত গাছের দৈহিক বৃদ্ধি কমে যায়। ফুল উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হয় এবং ফলন হ্রাস পায়।

দমন

ভার্টিমেক/ওমাইট/থিওভিট ২ মিলিলিটার/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

থ্রিপস/চুঙ্গি পোকা (Scirtothrips dorsalis / Thrips palmi)

গাছের যেকোনো অবস্থায় এ পোকার আক্রমণ হয়। তবে ফুল ফোটার সময়ই বেশি ক্ষতি করে। এই পোকা পাতার রস চুষে খায়। ফলে পাতা কুকড়ে যায়। আক্রান্ত গাছ বা পাতা তামাটে রঙ ধারণ করে।

দমন

প্রতি লিটার পানিতে ১.২ মিলিলিটার সাকসেস/এডমায়ার মিশিয়ে স্প্রে করে দমন করা যায়।

জাবপোকা/এফিড (Aphis gossypii/Myzus persicae)

পোকা গাছের কাণ্ড ও পাতার নিচে আক্রমণ করে। ফলে গাছের আকার ও বৃদ্ধি কমে যায় । মিষ্টি আঠালো পদার্থ নিঃসরণ করে ফলে পিঁপড়া আক্রমণ করে ও শুটিমোল্ড হয়। শুটিমোল্ড এর কারণে ফল কাল রং ধারণ করে এবং ফলে বাজারমূল্য কমে যায় । এফিড এর আক্রমণে ফলন কমে যায় এবং ভাইরাস রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে ।

মাকড় আক্রান্ত মরিচ

দমন

টাফগর/মেলাথিয়ন ১ মিলি প্রতি লিটার পানির সংগে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ১০ দিন পরপর ঔষধ পরিবর্তন করে স্প্রে করলে এফিড বৃদ্ধি দমন করা যায়। জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে যখন উপকারী পোকা জমিতে দেখা যাবে তখন স্প্রে করা যাবে না।

ফল ছিদ্রকারী পোকা

এই পোকা কচি ও বাড়ন্ত ফল ছেদ করে ভিতরে ঢুকে ফলের ভিতরের অংশ খেয়ে ফেলে। ফলে মরিচ বাড়তে পারে না এবং আকৃতি নষ্ট হয়, ঝাঁঝ থাকে না ও বাজার দর কম হয় ।

দমন

মরিচের ফুল আসার আগে জমিতে সেঙ ফেরোমন ফাঁদ (প্রতি বিঘায় ১৫টি) ব্যবহার করে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা। আক্রমণ তীব্র হলে সাকসেস ২.৫ ইসি অথবা প্রোক্লেম ৫ জি অথবা করলাঙ২৫ ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। ঔষধের মাত্রা বেশি হলে ফুল ঝড়ে পড়ে ।

মরিচের জমিতে ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন

প্রক্রিয়াজাতকরণ

মরিচ নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত করা যেতে পারে। আচার, সস ও পেস্ট ইত্যাদি সহজ পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে বাণিজ্যিকভাবে সফলতা লাভ করা যেতে পারে।

মরিচের পেস্ট

উপকরণসমূহঃ

কাঁচা/শুকনা মরিচ ১ কেজি, পানি ৩৩০ মিলিলিটার, সাইট্রিক এসিড ৫ গ্রাম, পটাশিয়াম মেটাবাইসালফাইড ০.৭৫ গ্রাম।

প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমে কাঁচা মরিচের বোঁটা ফেলে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। এবার মরিচের এনজাইমেটিক কার্যকারিতা নিষ্ক্রিয় করার জন্য গরম পানিতে ৩ মিনিট ধরে সিদ্ধ করুন। এই সিদ্ধ করা মচির ব্লেন্ডার মেশিনে/সিলপাটায় ঘষে পানির সাথে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। তারপর সাইট্রিক এসিড এবং পটাশিয়াম মেটাবাইসালফাইড সামান্য পানির সাথে গুলিয়ে মরিচ পেস্টের সাথে যোগ করে দিন। প্রাপ্ত পেস্ট পলিথিন ব্যাগ বা কাচের বোতলে বা প্লাস্টিক পাত্রে রেখে ২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় । শুকনো মরিচ হতেও মরিচের পেস্ট তৈরি করা যায় । তবে এক্ষেত্রে মরিচকে প্রথমেই পানিতে ১ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন

কাঁচা মরিচের আচার উপকরণসমূহঃ

ভিনেগার-৫

কাঁচা মরিচ-৫০০ গ্রাম, আদা বাটা-৫ গ্রাম, রসুন বাটা-১০ গ্রাম, হলুদ বাটা-৫ গ্রাম, মরিচ বাটা-৫ গ্রাম, সরিষা বাটা-৫ গ্রাম, ধনিয়ার ভাজাগুঁড়া-৩ গ্রাম, পাঁচফোড়ন ভাজাগুঁড়া-৮ গ্রাম, লবণ ২০ গ্রাম, চিনি -৭৫ গ্রাম, মিলিলিটার, তৈল-১৫০ মিলিলিটার।

প্রস্তুত প্রণালী

মরিচের বোঁটা ফেলে পানিতে ধুয়ে নিন। তেঁতুল পানিতে ভালোভাবে মিশানের পর কচলানোর পর উক্ত পানি ছেঁকে নিন এবং মরিচকে তেঁতুল পানিতে ডুবিয়ে রাখুন। সবরকম মসলা একসাথে কড়াইয়ে মিশিয়ে অল্প পানিসহ অল্প তেলে কষান। তেঁতুলের পানিতে ডুবানো কাঁচা মরিচ, লবণ, চিনি এবং ভিনেগার কড়াইতে একযোগে ভালোভাবে মিশান এবং মিশ্রণটি জ্বাল দিয়ে ঘন হলে গরম অবস্থায় জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরুন এবং অবশিষ্ট তেল বোতলে ঢেলে দিন। বোতলের মুখ ভালভাবে বন্ধ করুন যাতে বাতাস ঢুকতে না পারে। বোতলের আচার মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে ১ বছরের অধিক সময় ধরে ব্যবহার করা যায়।

শুকনা মরিচের আচার

উপকরণসমূহঃ

বড় মোটা শুকনো মরিচ-১ কেজি, আমচুর-২৫০ গ্রাম, সরিষা-১৩০ গ্রাম, কালো জিরা-১ চা চামচ, মেথি-১-২ চা চামচ, গরম মসলা-৫ চা চামচ, মৌরি-৩ চা চামচ, লবণ-১০০ গ্রাম, চিনি-১০-১২ চা চামচ, সরিষার তৈল-আচার ডুবে যাওয়ার মতো।

প্রস্তুত প্রণালি

মরিচের বোঁটা ফেলে দিয়ে গোড়ার কিছু অংশ কাঁচি দিয়ে এমনভাবে কাটুন যেন ভিতর থেকে বিচি ও শাঁস বের করা যায় । অথবা একপাশ চিরেও এ কাজ করা যেতে পারে। আমচুর, চিনি ও লবণ ছাড়া অন্যান্য সব মসলা শুকনা পাতিলে ভেজে পিষে গুঁড়া করে নিন। এই পেষা মসলার সঙ্গে লবণ, চিনি, আমচুর ও একটু সরিষার তৈল মিশিয়ে মেখে নিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। মরিচের কাটা অংশ দিয়ে সাবধানে পেস্ট মসলা কাঠি দিয়ে ঠেসে ঠেসে ভরে চেরা অংশ সুতা দিয়ে বেঁধে দিন। কাচের বোতল/জারে মসলা ভরা মরিচ একটার ওপর একটা সাজিয়ে রাখুন এবং ৩-৪ দিন রোদে রাখুন । সরিষার তেল গরম করার পর ঠান্ডা করে আচারে ঢেলে দিন যাতে মরিচ তেলে ডুবে থাকে। বোতল/জারের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করুন এবং মাঝে মাঝে রোদে দিন।

মরিচের সস্

উপকরণসমূহঃ

শুকনো মরিচ-১৬টি, ফুটানো পানি- ০.৭৫ কাপ, সয়াবিন তেল ১ চা চামচ, টমেটো পেস্ট-২ চা চামচ, পেষা রসুন- ১ কোয়া, জিরা গুঁড়া- ০.২৫ চা চামচ, ধনে গুঁড়া- ০.২৫ চা চামচ, চিনি- ০.৫ চা চামচ।

প্রস্তুত প্রণালী

মরিচের বোঁটা, বীজ ও শাস ফেলে ধুয়ে নিন। মরিচ ফুটানো পানিতে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। মরিচ মিহি করে বেটে ভিজানো পানির সাথে মিশান। সসপেন/কড়াই-এ মরিচ ও অন্যান্য সব উপকরণ একসাথে মিশিয়ে চুলায় দিয়ে নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি ফুটলে জ্বাল কমিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে ১০ মিনিট ফুটান। পরে ঠান্ডা করে কাঁচের বোতল/প্লাস্টিক বয়ামে সংরক্ষণ করুন।

আদা উৎপাদন প্রযুক্তি

ভূমিকা

আদা (Zingiber officinalae; পরিবার: Zingiberaceae) বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ মসলা ফসল হিসেবে পরিচিত । এটি এক প্রকার রাইজোম বা মৌলকাণ্ড জাতীয় ফসল, যা আদা মানে পরিচিত। খাবার সুস্বাদু করতে ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আদা কাঁচা, শুকনা এবং সংরক্ষণ করেও খাওয়া যায়। বিভিন্ন ঔষধিগুণসম্পন্ন এই মসলা অন্ত্রের রোগ, রক্তের কোলেস্টরল, রক্ত পাতলা রাখতে বাতের ব্যাথা কমাতে, বহুমূত্র রোগ, খিঁচুনী রোগ প্রতিরোধে এবং সর্দি-কাশি প্রভৃতি নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। টাটকা বা ফ্রেশ আদায় প্রতি ১০০ গ্রামে ২.৩ গ্রাম প্রোটিন, ১২.৩ গ্রাম শ্বেতসার, ১.০ গ্রাম উদ্বায়ী তেল, ২.৪ গ্রাম আঁশ, ১.২ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ৮০.৮ গ্রাম পানি বিদ্যমান। দেশে প্রতিবছর আদার চাহিদা প্রায় ৪.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২০-২১ সালে প্রায় ১১ হাজার হেক্টর জমিতে উৎপাদন হয় ০.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন (বিবিএস, ২০২২)।

জাত পরিচিতি

বারি আদা-১

এই জাতের গাছের গড় উচ্চতা ৭৯-৮২ সে.মি.। প্রতি গাছে টিলার বা কুশির সংখ্যা ৩০-৩২টি, পাতার সংখ্যা ২১০-২১২টি, প্রাইমারি রাইজমের সংখ্যা ৫৪-৫৭টি ও সেকেন্ডারি রাইজমের সংখ্যা ৩৯০-৩৯৫টি পর্যন্ত হতে পারে। কন্দ লাগানো থেকে উত্তোলন পর্যন্ত প্রায় ৩০০-৩১০ দিন সময় লাগে। জাতটির রোগ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো। প্রতি হেক্টর জমি থেকে গড়ে ৩০-৩২ টন ফলন পাওয়া যায়।

বারি আদা-২

এ জাতের জীবনকাল ৩০০-৩১৫ দিন। গাছের গড় উচ্চতা ৮৮.০০-৯০.৫০ সে.মি.,প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ৪৯৫-৫০৩টি, কুশির সংখ্যা ২৯.০-৩০.৮০টি, প্রাইমারি কন্দের ওজন ৬৬.৫০-৭০০ গ্রাম ও সেকেন্ডারি কন্দের গড় ওজন ৫৫০-৫৫৭ গ্রাম। জাতটি কাণ্ড পচা রোগ সহনশীল। প্রতি হেক্টর জমি থেকে গড়ে ৩৬-৩৮ টন ফলন পাওয়া যায় ।

বারি আদা-৩

এ জাতের জীবনকাল ৩০০-৩১০ দিন। গাছের গড় উচ্চতা ৭৫.৫০-৭৯.৫০ সে.মি.,প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ৪২৫-৪২৯টি, কুশির সংখ্যা ২৪-২৬টি, প্রাইমারি কন্দের গড় ওজন ৫৮.৫০-৬০.৫০ গ্রাম ও সেকেন্ডারি কন্দের গড় ওজন ৪৪০-৪৪২.৩৫ গ্রাম। জাতটি কান্ড পচা রোগ সহনশীল। প্রতি হেক্টর জমি থেকে গড়ে ২৮-২৯ টন ফলন পাওয়া যায়।

মাটি ও আবহাওয়া

জৈব পদার্থসমৃদ্ধ উর্বর দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশযুক্ত উঁচু জমি আদা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তুলনামূলকভাবে ঝুরঝুরে মাটিতে আদার বৃদ্ধি ও ফলন এই দু-ই বেশি হয়ে থাকে। আদা গাছের বৃদ্ধির জন্য আর্দ্র-উষ্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজন হয় । এছাড়া আদা গজানো ও বৃদ্ধির জন্য জমিতে যথেষ্ট রস থাকা দরকার। আদার জন্য বার্ষিক ৩০০০ মি.মি. বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় । দেশে বর্ষজীবী ফসল হিসেবে খরিফ মৌসুমে আদা রোপণ করে শীতের মাঝামাঝি থেকে সংগ্রহ করা হয়। ২৮-৩৫° সে. তাপমাত্রায় আদার চাষ করা যায় কিন্তু তাপমাত্রা ১০° সেন্টিগ্রেড এর নিচে চলে গেলে আদা গাছ মারা যায় । সমতল অঞ্চল থেকে শুরু করে ১৫০০ মি. উঁচু পার্বত্য এলাকায় ও আদার চাষ করা হয়ে থাকে। আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানেও আদা সফলভাবে চাষ করা যায় ।

রোপণ সময়

গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই জমি তৈরি করে এপ্রিল-মে (চৈত্র-বৈশাখ) মাসে আদা রোপণ করতে হয়। বৃষ্টি হতে বিলম্ব হলে সেচ প্রয়োগ করে জমিকে জো অবস্থায় এনে আদা রোপণ করা যেতে পারে। আদা গাছের দৈহিক বৃদ্ধির ৩-৪ মাস পর রাইজম উৎপন্ন হয়। এ কারণে বিলম্বে রোপণকৃত আদা গাছে রাইজম বা কন্দ যথাযথ বৃদ্ধি না হওয়ায় ফলন কম হয়।

জমি তৈরি

জমি লম্বা ও আড়াআড়িভাবে ৫-৬টি চাষ ও মই দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙ্গে ভালভাবে ঝুরঝুরে করে আগাছা, শিকড় ইত্যাদি উপড়ে ফেলে জমি তৈরি করতে হবে। এরপর ৪ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ২ মিটার প্রস্থের বেড তৈরি করে তার চারি-দিকে ১.৫ ফুট গভীর নালা তৈরি করতে হবে। উক্ত নালার মাটি বেডের উপর দিয়ে বেডকে আরও উঁচু করতে হবে। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য দুটি বেডের মাঝখানের নালা ৫০ সেমি প্রশস্ত হলে ভালো হয়।

সার প্রয়োগ

আদা জমি থেকে প্রচুর খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে, ভালো ফলন পাবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। আদা ফসলে হেক্টরপ্রতি নিম্নে উল্লেখিত পরিমাণে সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে-

সার	মোট পরিমাণ (কেজি)	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী	পরিচর্যা হিসাবে	প্রয়োগ
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
গোবর	৫ টন	সব	-	-	-
ইউরিয়া	৩০৪ কেজি	-	১৫২ কেজি	৭৬ কেজি	৭৬ কেজি
টিএসপি	২৬৭ কেজি	সব	-	-	-
এমওপি	২৩৩ কেজি	১১৬ কেজি	-	৫৯ কেজি	৫৮ কেজি
জিংক সালফেট	৩ কেজি	সব	-	-	-
জিপসাম	১১০ কেজি	সব	-	-	-
বোরিক এসিড	৩-৬ কেজি	সব	-	-	-

জমি চাষের সময় গোবর, টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া আদা রোপণের ৫০ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমপি সমানভাগে দুই কিস্তিতে রোপণের যথাক্রমে ৮০ ও ১১০ দিন পর জমিতে পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। এই সময় গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

বীজের আকার ও হার

৪০-৪৫ গ্রাম আকারের বীজ আদা ব্যবহার করলে হেক্টরপ্রতি প্রায় ২৮০০-৩২০০ কেজি বীজ আদারপ্রয়োজন হয়। এ জন্য বীজ রাইজোমকে সাবধানে ২.৫-৫ সেমি. দৈর্ঘ্যের দুই চোখবিশিষ্ট ৩৫-৪০ গ্রাম ওজনের খণ্ডে কেটে নিতে হবে। ছোট আকারের (৫-১০ সেমি.) বীজ রাইজোম পলিথিন ব্যাগে দিয়ে চারা তৈরি করেও মূল জমিতে রোপণ করা যায়।

বীজ শোধন

প্রায় ৮০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ বা ৮০ গ্রাম অটোস্টিন বা ১৬০ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড এম জেড-৪৫ মিশিয়ে তার মধ্যে ১০০ কেজি বীজ আদা ৩০-৪০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভেজা আদা পানি থেকে উঠিয়ে ছায়ায় রেখে শুকিয়ে জমিতে রোপণ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

সরু লাঙল দিয়ে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার দূরত্বে ৫-৬ সেন্টিমিটার গভীর সারি করে ২৫-৩০ সেন্টিমিটার ব্যবধানে বীজ আদা রোপণ করা হয়। নির্ধারিত বীজ রাইজমকে রোপণের পূর্বে ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে বালির উপর স্তূপীকৃত করে রাখলে ২-৩ মাসের মধ্যে অঙ্কুরোদগম হয় এবং তা রোপণ করা হয়।

আন্তঃপরিচর্যা

আদা রোপণের ৪-৬ সপ্তাহ পর অর্থাৎ আদা গজানোর পর ফসলের সাথে আগাছার প্রতিযোগীতা রোধ করার জন্য জমির আগাছা নিড়িয়ে নিতে হবে। বীজ রোপণের পর ৩-৪ বার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। ফসলকে আগাছামুক্ত করতে হবে। গাছের গোড়ার মাটি সারি বরাবর ২-৩ বার তুলে দিতে হবে । এর ফলে যে নালা তৈরি হবে তা সেচ ও পানি নিষ্কাশনের কাজে লাগে।

সেচ

পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি না হলে ৩-৪ বার সেচ দেওয়া প্রয়োজন। আদার জমিতে এমনভাবে সেচ দিতে হবে যাতে জমিতে পরিমিত রস থাকে কিন্তু জমি অতিরিক্ত ভেজা/দাঁড়ানো পানি না থাকে ।

মালচিং আদা রোপণের পর পাতা/খড় দিয়ে জমি মালচিং করা হয়। এতে জমির রস সংরক্ষিত থাকে ও ভূমি ক্ষয় রোধ হয়। কিছুদিন পর এসব পাতা/খড় পচে গিয়ে জমিতে জৈব উপাদান বৃদ্ধি করে। তাছাড়া ধইঞ্চা, কলাই, শিম, বরবটি ইত্যাদি গাছের ছায়ায় আদা করে মালচিং এর সুবিধা পাওয়া যায়।

পিলাই তোলা

আদা রোপণের পর গাছ ও শিকড় গজিয়ে গেলে বীজ আদা তুলে নেওয়া যায়। এতে গাছের বৃদ্ধিতে তেমন কোনোক্ষতি হয় না। এ থেকে উত্তোলিত বীজ আদা বিক্রি করে কিছু আর্থিক লাভ হয়। এই পদ্ধতিটিকে পিলাই তোলা বলে। বীজ আদা লাগানোর সময় সবগুলো বীজের অঙ্কুরিত মুখ একই দিকে রাখতে হয় যাতে বীজ আদা রোপণের ৭৫-৯০ দিন পর সারির শুধুমাত্র এক পাশের মাটি সরিয়ে সহজেই পিলাই সংগ্রহ করা যায়। এভাবে বীজ খরচের ৫০-৬০ ভাগ পিলাই থেকে উঠে আসে ।

আন্তঃ ও মিশ্র ফসল

আদা অন্য ফসলের (আনারস, মরিচ, মুগ, ভুট্টা, লাউ, শিম, পেঁপে, করলা ও অন্যান্য সবজিজাতীয়) সাথে আন্তঃ ও মিশ্র ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। এমনকি আন্তঃফসল হিসেবে ফলজ বৃক্ষের নিচে যেমন- কাঁঠাল, নারিকেল, খেজুর ও সুপারি বাগানে ভালোভাবে চাষ করা যায়।

ফসল সংগ্রহ

সাধারণত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে আদা উত্তোলন করা হয়। আদা রোপণের ৯-১০ মাস পরেই আদা উত্তোলনের সময় হয়। আদা পরিপক্কতা লাভ করলে গাছের পাতা ক্রমশ হলদে হয়ে কাণ্ড শুকাতে শুরু করে। এ সময় আদা উত্তোলন করে, মাটি ঝেড়ে ও শিকড় পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করা হয়।

বীজ আদা সংরক্ষণ

বড় আকারের বীজ রাইজোম ছায়ামুক্ত স্থানে মাটির নিচে গর্ত/পিট তৈরি করে সংরক্ষণ করা হয়। গর্তে সংরক্ষণ করার পূর্বে বীজ আদা ০.১% কুইনালফস এবং ০.৩% ডায়াথেন এম-৪৫ এর দ্রবণে শোধন করা হয়। উক্ত দ্রবণ থেকে উঠিয়ে রাইজোম ছায়ায় শুকানো হয়। গর্তের দেওয়ালের চারিদিক গোবরের তৈরি পেস্ট দিয়ে প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে আদা রাখা হয়। আদার প্রতি স্তরের উপর ২ সেন্টিমিটার পুরু শুকনো বালি বা করাতের গুঁড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। বায়ু চলাচলের জন্য গর্তের উপরিভাগে ও পাশে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফাঁকা জায়গা রেখে দেওয়া হয়।

বীজ আদা সংরক্ষণ

রোগবালাই

কন্দ পচা রোগ

কন্দ পচা রোগ আদা ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে এবং এ রোগে আদা আংশিক থেকে সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । বীজ আদা, মাটি, ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ও সেচের পানির মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার ঘটে। আদা গাছের কাণ্ডের গোড়ার মাটির সংযোগস্থলে প্রথমে আক্রমণ শুরু হয় এবং এই রোগ ক্রমশ উপর ও নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পচন দ্রুত রাইজোমের দিকে অগ্রসর হয়। Pythium sp., Fusarium sp., Pseudomonas sp. ইত্যাদি জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া এবং Melodz-gyne sp. (Root knot Nematode) এবং এদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ এ রোগের প্রধান কারণ।

লক্ষণ

বর্ষাকালে ৪-৬ সেন্টিমিটার উচ্চতার গাছে এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়। গাছের নিচের দিকের পাতার প্রান্তভাগে প্রথমে হলুদাভ দেখায় এবং এটা পর্যায়ক্রমে পাতার কিনারা ও পত্রফলকের দিকে বিস্তার লাভ করে। গাছের উপর এবং নিচের সমস্ত পাতা হলুদ হয়ে গাছ ঝিমিয়ে পড়ে। পচনের ফলে কন্দ নরম হয়ে ফুলে ওঠে, অভ্যন্তরীণ টিস্যু সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। আক্রান্ত রাইজোম থেকে এক ধরনের দুর্গন্ধ বের হয়ে এই দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে রাইজোম ফ্লাই নামক পোকা আদায় আক্রমণ করে। আক্রান্ত গাছ টান দিলে সহজে উঠে আসে।

দমন পদ্ধতি

- যে সমস্ত জমিতে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় সে সমস্ত জমি এড়িয়ে চলা ।
- আক্রান্ত জমিতে আদা লাগানো যাবে না এবং রোগমুক্ত জমিতে রোপণ করতে হবে।
- একই জমিতে বারবার আদা চাষ না করা।
- উত্তম পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাযুক্ত জমিতে আদা চাষ করতে হবে।
- বীজ আদার জন্য শুধু সুস্থও নীরোগ গাছ নির্বাচন করতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধের জন্য রোগমুক্ত পুষ্ট বীজ আদা রোপণ
- জুলাই হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সার্বক্ষণিক পর্যাবেক্ষণ এবং রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুপারিশ কৃত দমন ব্যবস্থা নিতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ রাইজোমসহ সম্পূর্ণরূপে তুল ধ্বংস করতে হবে।
- উঁচু জমিতে আদা চাষ করতে হবে।
- রোপণের পূর্বে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড মিশিয়ে দ্রবণে বীজ কন্দ ৩০ মিনিট ডুবিয়ে ছায়ার নিচে শুকিয়ে রোপণ করতে হবে এবং একই পদ্ধতিতে আদা উত্তোলনের পর শোধন করে বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- আদা বীজ রোপণের পূর্বমুহূর্তে জমিতে স্ট্যাবল ব্লিচিং পাউডার বিঘাপ্রতি ৩.৫-৪ কেজি হারে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস যখন আক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন সঙ্গে সঙ্গে ব্লাইটক্স ৫০ বা ব্লু-কপার (কপার অক্সিক্লোরাইড ৫০% ডব্লিউপি) প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম হারে মিশিয়ে মাটির সংযোগস্থলে ১৫-২০ দিন পরপর গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। একই সাথে রিপকর্ড ১ মিলি ও রিডোমিল গোল্ড ৪ গ্রাম হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে কাণ্ড ও মাটির সংযোগস্থলে ১৫-২০ দিন পরপর প্রয়োগ করতে হবে। এই ব্যবস্থা আগস্ট হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে।

লিফ ব্রাইট

বর্ষার শুরুতে আদায় এই রোগ দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণে গাছের পাতায় ডিম্বাকৃতির দাগ দেখা যায়। রোগের তীব্রতা বাড়লে দাগগুলো মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার ফলে সম্পূর্ণ পাতা শুকিয়ে যায়।

দমন

- রোগ প্রতিরোধী জাত নির্বাচন করতে হবে।
- রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে।
- আংশিক ছায়ায় আদা চাষ করতে হবে।
- আদার কন্দ সংরক্ষণের পূর্বে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-অটোস্টিন) অথবা কার্বোক্সিন + থিরাম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন- প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউপি) প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৬০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং ৪৮ ঘণ্টা পর সংরক্ষণ করতে হবে। আদার কন্দ লাগানের পূর্বেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- জমিতে রোগের আক্রমণ দেখা দিলে মেটালেক্রিল + মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-রিডোমিল গোল্ড) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-অটোস্টিন) ১ গ্রাম হারে মিশিয়ে পাতার উভয় পৃষ্ঠে স্প্রে করতে হবে।

পোকা-মাকড়

রাইজোম ফ্লাই

আদার রাইজোম Pythium জাতীয় ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হলে মাটির নিচে আদার রাইজোম পচে গিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত রস বের হয়। আর তখন এই পোকা রাইজোমকে আক্রমণ করে। রাইজোম আক্রান্ত না হলে এই পোকা আসার সম্ভাবনা থাকে না।

দমন

এ পোকার আক্রমণ হলে ডারসবান ০.২% হারে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

পাতাখেকো পোকা (Leaf feeders)

বাড়ন্ত গাছে এ পোকার আক্রমণে পাতার ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে গাছের সালোক সংশ্লেষণ হ্রাস পায়। এতে করে ফলন কমে যায়।

দমন

এ পোকা দমনের জন্য ১০ দিন পরপর ২-৩ বার বিকেল বেলায় ০.৫% হারে ডেসিস বা ০.২% রাইসন বা রিপকর্ড ঔষধ স্প্রে করতে হবে।

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা (Stem borer)

এ পোকা কান্ডের মাঝামাঝি ছিদ্র করে এর বাড়ন্ত কুশিতে ডিম পাড়ে। ফলে আক্রান্তকুশি হলুদ হয়ে গাছ শুকিয়ে যায়।

দমন

কাণ্ডে ছিদ্র দেখামাত্রই ০.২% হারে সেভিন ডাস্ট ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

হলুদ উৎপাদন প্রযুক্তি

ভূমিকা

হলুদ (Curcuma sativa; পরিবার: Zingiberaceae) বাংলাদেশের মানুষের নিকট বহুল প্রচলিত ও একটি সুপ্রাচীন মসলা। হলুদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে উৎপাদিত মসলা ফসলের মধ্যে হলুদের স্থান তৃতীয়। দেশে দৈনন্দিন রান্নায় এর ব্যবহার সর্বজনবিদিত। মসলা হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও হলুদ নানাবিধ প্রসাধনী সামগ্রী ও রং শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হলুদ কাঁচা খেলে চর্মরোগ দূর হয়, রক্ত পরিষ্কার ও হজমে সহায়তা করে, গ্যাসজনিত পেটের ব্যথা উপশমে, বাত রোগ দূরীকরণে এবং গরম চুন ও হলুদের মিশ্রণ প্রলেপ হিসাবে ব্যথা উপশমে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়াও বিয়েসহ অন্যান্য সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হলুদের ব্যবহার সকলেরই জানা। শুকনা হলুদে শতকরা ৬৯.৪০ ভাগ শ্বেতসার, ৬.৩০ ভাগ প্রোটিন, ৫.১০ ভাগ তেল, ৩.৫০ ভাগ খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য উপাদান আছে। কারকিউমিন নামক রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির কারণে এর রঙ হলুদ এবং টারমেরন নামক উপাদানের জন্য বিশেষ গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে হলুদের গড় ফলন ৮.৩৮ টন/হেক্টর। হলুদের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১.২০ লক্ষ মেট্রিক টন, দেশে ২০২০-২১ সালে হলুদের মোট আবাদি জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ০.২৬ লক্ষ হেক্টর এবং এ জমি থেকে ২.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন হলুদ উৎপাদিত হয় (বিবিএস, ২০২২)।

জাত পরিচিতি

হলুদ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যেমন- হালকা, গাঢ় হলুদ, কমলা ইত্যাদি রঙের হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণার মাধ্যমে হলুদের পাঁচটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। জাতগুলো হচ্ছে বারি হলুদ-১ (ডিমলা), বারি হলুদ-২ (সিন্দুরী), বারি হলুদ-৩, বারি হলুদ-৪ ও বারি হলুদ-৫।

জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

বারি হলুদ-১ (ডিমলা)

উচ্চফলনশীল এই জাতের গাছের উচ্চতা প্রায় ৮৫-৯০ সে.মি.। পাতার সংখ্যা ৯-১০টি। প্রতি গাছে ছড়ার সংখ্যা ৭-৮টি। মোথার ওজন প্রায় ১২৫-১৩০ গ্রাম। প্রতি গোছায় হলুদের ওজন প্রায় ৪০০-৪২০ গ্রাম। অন্তর রং (Core color) হলুদ। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৭-১৮ টন।

বারি হলুদ-২ (সিন্দুরী)

এ জাতের গাছের গড় উচ্চতা ৮৫-৮৭ সেমি। প্রতি গাছে গোছা ২-৩টি, ছড়ার সংখ্যা ৭-৮টি। মোথার ওজন ৮৫-৯০ গ্রাম। প্রতি গোছায় হলুদের ওজন ৩৭৫-৩৮০ গ্রাম। অন্তর রং(Core color)গাঢ় হলুদ। হেক্টর প্রতি ফলন ১২-১৩ টন ।

বারি হলুদ-৩

এ জাতের গাছের উচ্চতা গড়ে প্রায় ১১০-১২৫ সে.মি.। প্রতি গাছে মোথার ওজন প্রায় ১৫০-১৮০ গ্রাম। প্রতি গোছায় হলুদের ওজন প্রায় ৭০০-৮০০ গ্রাম হয়ে থাকে। অন্তর রং (Core color) গাঢ় হলুদ। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন।

বারি হলুদ-৪

গাছের উচ্চতা ১১০-১২০ সেন্টিমিটার। গাছপ্রতি পাতার সংখ্যা ২২-২৮টি, পাতা ৫০-৫২ সেন্টিমিটার লম্বা। পাতার রং হালকা সবুজ। প্রতি গোছায় মোথার সংখ্যা ৩-৫টি (৫৫-৬০ গ্রাম), ছড়ার (ফিঙ্গার) সংখ্যা ২২-২৫টি (৪৫০-৫৫০ গ্রাম), ছড়া (ফিঙ্গার) ৯.০-৯.৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ২.৫-৩.০ সেন্টিমিটার চওড়া। অন্তর রঙ (Core color) কমলা হলুদ (Organge Yellow) এবং শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) পরিমাণ শতকরা২০-২২ ভাগ ।

বারি হলুদ-৫

গাছের উচ্চতা ১২০-১৩৫ সেন্টিমিটার ও গাছপ্রতি পাতার সংখ্যা ২৪-৩০টি, পাতা ৬২-৬৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৮-২০ সেন্টিমিটার চওড়া। পাতার রং হালকা সবুজ। প্রতি গোছায় গাছের সংখ্যা ৪-৬টি। প্রতি গোছায় মোথার সংখ্যা ৩-৪টি (৩০-৪০ গ্রাম), ছড়ার (ফিঙ্গার) সংখ্যা ২০-২২টি (২৫০-৩০০ গ্রাম), ছড়া (ফিঙ্গার) ৯.০-১০.০ সেন্টি-মিটার লম্বা এবং ২.০-২.৫ সেন্টিমিটার চওড়া। অন্তর রং (Core color) গাঢ় কমলা হলুদ (Deep Organge Yellow) এবং শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) পরিমাণ শতকরা ২৬-৩০ ভাগ। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় হলুদের স্থানীয় নানারকম জনপ্রিয় জাত রয়েছে, যার মধ্যে আরানি, কুকুরমণি, আদাগাইট্যা, সোনামুখী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

মাটি ও আবহাওয়া

প্রায় সকল ধরনের মাটিতেই হলুদের চাষ করা সম্ভব। পানি নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত জৈব পদার্থসমৃদ্ধ দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ বা পলি মাটি হলুদ চাষের জন্য উত্তম। ৫-৬ অম্লত্বযুক্ত মাটি হলুদ চাষের জন্য উপযোগী। বার্ষিক ১৫০০ মিমি বৃষ্টিপাত এবং ২০ক্ক-৩০ক্ক সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হলুদ ভালো জন্মে । অপেক্ষাকৃত আর্দ্র মাটি ও হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে হলুদ আবাদ করা যায়। সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহে একবার বৃষ্টি হলে রাইজোমের আকার বৃদ্ধি পায়।

মাটি শোধন

গভীরভাবে চাষ দিয়ে মাটি উল্টিয়ে দিলে রোগজীবাণু ও পোকামাকড় সূর্যের তাপে নষ্ট হয়ে যাবে। মাটির ওপর খড়কুটা দিয়ে ১০-২০ সেমি.পুরু স্তর তৈরি করে পুড়িয়ে অথবা জমিতে বিঘাপ্রতি ১.৫-২.০ কেজি ফুরাডান বা নিম কেক (২ কেজি/শতকে) প্রয়োগের মাধ্যমে মাটি শোধন করা যায়।

বীজ শোধন

১০০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ অথবা অটোস্টিন মিশিয়ে বীজকে ৩০-৪৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভিজানো বীজকে ছায়াযুক্ত জায়গায় শুকিয়ে তারপর জমিতে রোপণ করতে হবে।

রোপণের সময়

মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের মধ্যে প্রথম বৃষ্টিপাতের পর জমিতে জো আসার সাথে সাথে হলুদ রোপণ করতে হবে। বিলম্বে মে মাসেও হলুদ রোপণ করা যায় ।

বীজের আকার ও হার

২৫-৩০ গ্রাম আকারের বীজ রোপণের জন্য উত্তম। বীজের হার নির্ভর করে মোথা/ছড়া রোপণের ওপর। বীজ হিসেবে মোথা উত্তম এবং ফলনও বেশি দেয়। তবে ছড়া ব্যবহার করলে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ বীজের দরকার। সাধারণত প্রতি হেক্টরে ২০০০-২৪০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। ছোট আকারের (৫-১০ গ্রাম) বীজ রাইজোম পলিথিন ব্যাগে দিয়ে চারা তৈরি করেও হলুদ রোপণ করা যায় ।

জমি তৈরি ও রোপণ দূরত্ব

জমি তৈরি করতে ৩-৪টি চাষ ও মই দিতে হবে। সাধারণত হলুদের জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২৫ সেমি.রাখা হয়। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের জন্য দুই বেডের মাঝে ৬০ সেমি. প্রশস্ত নালা থাকতে হবে।

সার প্রয়োগ

কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের ওপর সারের পরিমাণ নির্ভর করে। ভালো ফলন পেতে হলে হলুদের জমিতে প্রচুর পরিমাণ জৈবসার প্রয়োগ করতে হয়। হলুদ চাষের জন্য হেক্টর প্রতি নিম্নোক্ত জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সার	মোট পরিমাণ (কেজি)	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী ১ম কিস্তি	পরিচর্যা হিসাবে ২য় কিস্তি	প্রয়োগ ৩য় কিস্তি
গোবর	৫ টন	সব	-	-	-
ইউরিয়া	৩২৫ কেজি	৬০ কেজি	৬৫ কেজি	১০০ কেজি	১০০ কেজি
টিএসপি	৩০০ কেজি	সব	-	-	-
এমপি	২৮০ কেজি	৮০ কেজি	-	১০০ কেজি	১০০ কেজি
জিংক সালফেট	১৪ কেজি	সব	-	-	-
জিপসাম	১৪০ কেজি	সব	-	-	-
বোরিক এসিড	৮ কেজি	সব	-	-	-

জমি চাষের সময় গোবর, টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া হলুদ রোপণের ৫০ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমপি সমানভাগে দুই কিস্তিতে রোপণের যথাক্রমে ৮০ ও ১১০ দিন পর জমিতে পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। এই সময় গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা

মাটি শুষ্ক হলে বীজ রোপণের পরপরই সেচ দিতে হবে। হলুদের কন্দের সার্বিক বৃদ্ধি ও পানি নিষ্কাশনের জন্য দুই সারির মাঝের মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। বীজ রোপণের ৫০-৫৫ দিন, ৮০-৮৫ দিন এবং ১০০-১২০ দিন পর আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। হলুদ রোপণের পর খড় বা কচুরিপানা দিয়ে মালচিং করলে হলুদ ভাল গজায়।

ফসল সংগ্রহ

ফসল সংগ্রহের সময় জাতের ওপর নির্ভর করে। রোপণের ৯-১০ মাস পর গাছের পাতা যখন হলদে রং ধারণ করে শুকিয়ে যায় তখনই হলুদ সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। হলুদ জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে। আগাম জাত ৭-৮ মাস পর উঠানো হয়। বিলম্বে সংগ্রহ করলে হলুদের কারকিউমিন বা রং কমে যাবে। ফসল সংগ্রহের জন্য লাঙ্গল/কোদাল দিয়ে খুব সতর্কতার সাথে জমি খুঁড়ে হাত দিয়ে হলুদ সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহের পরে হলুদের লেগে থাকা মাটি, শিকড়, গাছের কাণ্ড ও পাতা পরিষ্কার করা হয়। এরপর মোথা ও ছড়া পৃথক করা হয়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ ঘাম ঝরানো

হলুদের মোথা ও ছড়াকে আলাদাভাবে পরিষ্কার ছায়াযুক্ত স্থানে গাদা করে রেখে পরিষ্কার পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ২-৩ দিনের মধ্যে হলুদ থেকে উৎপন্ন ঘাম সম্পূর্ণরুপে ঝরে যায়। এই প্রক্রিয়াকে হলুদের ঘাম ঝরানো বা সোয়েটিং বলে।

সংরক্ষণ

সাধারণত হলুদের মোথাকে বীজ হিসেবে রাখা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে মোথা হতে উৎপন্ন গাছ অপেক্ষাকৃত সবল হয়। তাছাড়া হলুদের ছড়াও বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে ফলন কম হয়। হলুদের ছড়াকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে গুঁড়া ও পেস্ট করে খাওয়ার উপযোগী করা হয়। দেখতে বড়, হৃষ্টপুষ্ট হলুদ বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

বাছাইকৃত হলুদ মাটির গর্তে রাখলে তা বেশি দিন পর্যন্ত ভাল রাখা যায়। উঁচু জমিতে ১ফ১ফ১ ঘনমিটার গর্ত করে তা বেশ কয়েক দিন খোলা রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। গর্তের গভীরতা বেশি হলে অধিক আর্দ্রতার কারণে হলুদের শিকড় ও গজানোর পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় এবং হলুদ পঁচে যায়। হলুদের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে ভিতরের চারপাশে খড় বিছিয়ে দিতে হবে। গর্ত হলুদ দিয়ে ভর্তি করার পর ওপরে খড় বিছিয়ে বালি মাটি চাপা দিয়ে গর্ত বন্ধ করে দিতে হবে। গর্ত খোড়ার সুযোগ না থাকলে হলুদের বীজ গাছের ছায়া বা ভালোভাবে বাতাস চলাচল করে এমন ঘরে রাখা যায়। পরে হলুদের পাতা দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে। এছাড়াও বীজ হলুদের গর্তের মুখ এক/দুই ছিদ্র বিশিষ্ট কাঠের তক্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, যাতে বায়ু চলাচল করতে পারে। বীজ হলুদ মাটির গর্তে রাখার উদ্দেশ্যেই হচ্ছে হলুদের আর্দ্রতা ধরে রাখা। কারণ খোলা বাতাসে থাকলে হলুদের সতেজতা ও ওজন কমে যায়।

সিদ্ধ করা

হলুদের স্বাদ ও গন্ধ অক্ষুণ্ন রাখা, শুকানোর সময় হ্রাস করা, শ্বেতসারসমৃদ্ধ এবং উন্নত রঙের হলুদ উৎপাদনের জন্য রাইজোম সিদ্ধ করা হয়। এ কাজে অ্যালুমিনিয়াম/স্টিল/মাটির পাত্র/ড্রাম ব্যবহার করা যায়। পরিষ্কার রাইজোম উক্ত পাত্রে ৪৫-৬০ মিনিট পরিষ্কার পানিতে সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ করার সময় পাত্রে অর্ধেক পানি দিলেও চলে। তবে যখন সাদা বাষ্প বের হওয়া শুরু হয়, তখন চটের বস্তা দিয়ে হলুদ ঢেকে দিতে হয় যাতে উত্তপ্ত বাষ্প পাত্রের উপরের অংশে সমভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং ফুটন্ত পানি ছিটে সিদ্ধকারীর গায়ে না লাগে। হলুদ সিদ্ধ করার সময় সোডিয়াম কার্বনেট বা সোডিয়াম বাইকার্বনেট (১ গ্রাম/লিটার) পানির সাথে মিশিয়ে অ্যালকালাইন দ্রবণ তৈরি করতে হবে। অ্যালকালাইন রাইজোমকে নরম এবং কমলা-হলুদ রং আনতে সহায়তা করে। এভাবে ১ ঘণ্টা যাবত সিদ্ধ করে হলুদ যখন কিছুটা নরম হয় এবং সাদা ফেনা ও হলুদের গন্ধযুক্ত সাদা ধোঁয়া নির্গত হলে পাত্রের পানি অন্য পাত্রে ঢেলে রেখে সিদ্ধ হলুদ সংগ্রহ করতে হবে। প্রাপ্ত গরম পানি ব্যবহার করে 'আবারও হলুদ সিদ্ধ করা যায়। হলুদবেশি সিদ্ধ হলে রং নষ্ট হয়ে যায়। আবার কম সিদ্ধ হলে শুকানোর পর হলুদ বেশি পরিমাণে ভেঙে যায় ।

শুকানো

হলুদ শুকানোর জায়গা অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে এবং গোবর দিয়ে লেপা যাবে না। শুকানোর সময় হলুদকে ময়লা, পোকা, পাখি, ইঁদুর, মোল্ড ও ধুলাবালি হতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখতে হবে। সিদ্ধ করার পরপরই হলুদ ৫-৬ সেন্টিমিটার পুরু করে বাঁশের চাটাই বা পাকা মেঝেতে বিছিয়ে সূর্যের আলোতে শুকাতে হয়। খুব বেশি মোটা স্তর করে হলুদ শুকালে রং খারাপ হয়ে যেতে পারে। রাতে হলুদ ঢেকে রাখতে হবে। এভাবে হলুদ শুকাতে ১০-১৫ দিন সময় লাগে। শুকনা হলুদ ভাঙলে যদি মেটালিক শব্দ হয় এবং আর্দ্রতা ৮-১০% হলুদ শুকানো এর মধ্যে হলে বুঝতে হবে হলুদ শুকানো সঠিক হয়েছে। শুকানো হলুদ হাত দিয়ে নাড়লে পাথরের মতো শক্ত অনুভূত হয়। সাধারণত ১০০ কেজি কাঁচা হলুদ শুকিয়ে ২০-৩০ কেজি শুকনো হলুদ পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, ফালি করে কাটা হলুদ সোলার বা কেবিনেট ড্রায়ার ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে শুকানো হলে রোদে শুকানোর চেয়ে রং ভালো হয়।

মসৃণ করা

শুকানো হলুদ বিভিন্ন ধরনের আঘাতজনিত কারণে খারাপ দেখায়। তাই শুকানো হলুদ পাটের বস্তায় ভরে পা দিয়ে না নেড়ে ব্যারেল অথবা সীড ড্রেসার ড্রামের মধ্যে নিয়ে হাত বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত বেগে ঘোরাতে হবে। এই হলুদ আরও পরিষ্কার ও মসৃণ করার জন্য পরিষ্কার পাথরের টুকরার সাথে মিশিয়ে ড্রামে ঘুরানো হয়। চূড়ান্তভাবে মসৃণ করার জন্য পুনরায় বিদ্যুৎচালিত ড্রামে হলুদ রেখে ঘুরানো হয়।

রং করা

মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক কৃত্রিম রং লেড ক্রোমেট বা মিডিল ক্রোস বা মিশিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি হিসেবে ফিটকিরি ৪০ গ্রাম, হলুদগুঁড়া ২ কেজি, রেড়ির তেল ১৪০ গ্রাম, সোডিয়াম বাইসালফেট ৩০ গ্রাম, হাইড্রোক্লোরিক এসিড ৩০ মিলিলিটার একত্রে মিশিয়ে তাতে ১০০ কেজি মসৃণকৃত হলুদ মাখিয়ে নিয়ে রং করা যেতে পারে।

গুঁড়া করা

শুকনা হলুদ মেশিনে ভেঙে গুঁড়া করা হয় এবং ছেঁকে ময়লা/অপদ্রব্য পরিষ্কার করা হয়। হলুদ গুঁড়া করার সাথে সাথে প্যাকেট করতে হবে। তা না হলে বাতাসের আর্দ্রতা গ্রহণ করে হলুদ পাউডার নষ্ট হয়ে যাবে। টিন বা একস্তর বিশিষ্ট ছোট পলিথিন ব্যাগ হলুদ গুঁড়া রাখার জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ হলুদ গুঁড়ার প্রায় ৬০% উদ্বায়ী তেল নষ্ট হয়। তাই দুই স্তর বিশিষ্ট পলিথিন ব্যাগ অথবা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের প্যাকেট হলুদ সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। সংরক্ষিত হলুদ গুঁড়া মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে ছত্রাকমুক্ত রাখতে হবে।

মানসম্পন্ন হলুদ

মানসম্পন্ন হলুদে আর্দ্রতার পরিমাণ <৯%, কারকিউমিন ৫৬.৬%, বহিস্থ পদার্থ <০.৫%, ছাতাধরা <৩% এবং উদ্বায়ী তেল <৩.৫ মিলিমিটার/১০০ গ্রাম থাকতে হবে। যে হলুদ দেখতে কমলা-হলুদের মতো হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে তার চাহিদা সবচেয়ে বেশি।

হলুদের রোগ ও তাদের ব্যবস্থাপনা

ট্যাফরিনা লিফ ব্লোচ

Taphrina maculens নামক ছত্রাক দ্বারা হলুদের এই রোগ হয়। বর্তমানে হলুদের এই রোগ বাংলাদেশে ভয়ানক রূপে দেখা দিয়েছে। এই রোগের ফলে হলুদের ফলন আশানুরূপ পাওয়া যায় না। সাধারণত আগস্ট মাস হতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় এবং অক্টোবর হতে নভেম্বর পর্যন্ত এর প্রভাব অত্যধিক হয়।

রোগের লক্ষণ

১. এই রোগের আক্রমণ প্রথমে পাতার কিনারা থেকে শুরু হয়।
২. প্রথমে হলুদের পাতা হালকা হলুদ হয় ও পরে ছোট ছোট লাল স্পটের আকার ধারণ করে।
৩. অসংখ্যা ছোট ছোট স্পট একত্রিত হয়ে বড় আকার ধারণ করে। এর ফলে সমস্ত পাতাটা আগুনে পুড়ে যাওয়ার মতো মনে হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- জমির ময়লা আবর্জনা পুড়ে ফেলতে হবে ।
- রোগ প্রতিরোধী জাত নির্বাচন করতে হবে।
- রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে।
- কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-অটোস্টিন) অথবা কার্বোক্সি + থিরাম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন-প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউপি) প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ঐ দ্রবণের মধ্যে বীজ হলুদ আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে শোধন করে উঠিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে জমিতে লাগাতে হবে।
- রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রোপিকোনাজোল গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-টিল্ট ২৫০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা মেটিরাম + পাইরাক্লস্ট্রোবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-ক্যাবরিওটপ) ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর পাতার উভয় পৃষ্ঠে স্প্রে করতে হবে।

কল্লিটোট্রিকাম লিফ স্পট

Colletotrichum capsici নামক ছত্রাক দ্বারা এই রোগ হয়। এতে হলুদের ফলন ৫০-৬০% পর্যন্ত কম হতে পারে।

রোগের লক্ষণ

(১) নতুন পাতার উপরের অংশে বাদামি রঙের বিভিন্ন রকম স্পট দেখা যায়
(২) স্পটগুলোর অনিয়মিত আকারের হয় ও এর কেন্দ্রের অংশ সাদা বাধূসর রঙের হয়
(৩) পরবর্তীতে স্পটগুলো একত্রিত হয়ে বড় আকার ধারণ করে ও সমস্ত পাতা আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে যায়
(৪) ফলে হলুদের কন্দ ভালো হয় না।

দমন ব্যবস্থাপনা

- জমির ময়লা আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধী জাত নির্বাচন করতে হবে।
- রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে।
- কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-অটোস্টিন) অথবা কার্বোক্সি + থিরাম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউপি) প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ঐ দ্রবণের মধ্যে বীজ হলুদ আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে শোধন করে উঠিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে জমিতে লাগাতে হবে ।
- রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রোপিকোনাজোল গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-টিল্ট ২৫০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে পাতার উভয় পৃষ্ঠে স্প্রে করতে হবে।

রাইজোম রট

এই রোগের আক্রমণ হলে কন্দ পচে যায়, ফলে গাছটি মরে যায়।

প্রতিকার

- বীজ ও মাটি শোধন করতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ মাটিসহ উঠিয়ে গর্ত করে পুতে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোগাক্রান্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না।
- রোগের লক্ষণ দেখা গেলে ব্লাইটক্স ৫০, রিডোমিল গোল্ড ৪ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ১৫-২০ দিন পরপরগাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।

পোকামাকড়

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা

এ পোকার কীড়া কান্ড ছিদ্র করে ভিতরের অংশ খেয়ে ফেলে এবং আক্রান্ত কাণ্ডের উপরের অংশ মরে যায় ।

পাতা মোড়ানো পোকা

এ পোকার কীড়া পাতা মুড়িয়ে ভিতরে বাস করে এবং পাতা খেয়ে গাছের সমূহ ক্ষতি করে। মাঠে রাইজোম থেকে রস চুষে খায়। সংরক্ষণের সময় এই পোকা রাইজমকে পঁচিয়ে ফেলে ।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ম্যালাথিয়ন (২.০ মিলিলিটার/লিটার) স্প্রে করতে হবে ।
- দানাদার ইনসেকটিসাইড (ফুরাডান) মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।

কালোজিরা উৎপাদন প্রযুক্তি

ভূমিকা

কালোজিরা (Nigella sativa) **Ranunculaceae** পরিবারভুক্ত একটি বর্ষজীবী গুল্মজাতীয় গাছ। যা উৎপাদন ও ব্যবহারের দিক থেকে গৌণ হলেও জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ মসলা ফসল। কনফেকশনারী ও রন্ধনশালায় দৈনন্দিন বিভিন্ন খাদ্য তৈরিতে এর জুড়ি নেই। কালোজিরার ঔষধি গুণাবলিও কম নয়। পেট ফাঁপা, চামড়ার ফুস্কুরী, মায়েদের প্রসব ব্যথা,ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাজমা ও কফ দূর করতে এটি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া শরীরের মূত্রবর্ধক ও উদ্দীপক হিসেবে কালোজিরা ব্যবহৃত হয়। এদেশে অল্প জমিতে বিচ্ছিন্নভাবে কালোজিরার চাষ হয়ে থাকে। ২০২০-২১ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১০০০ হেক্টর জমিতে ১০৬৮ মেট্রিক টন কালোজিরা উৎপাদন হয়েছে (বিবিএস, ২০২২)। অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন খরচ, তুলনামূলক কম উর্বর জমিতেও একই উৎপাদনশীলতা, রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদূরভাব কম, দীর্ঘদিন সংরক্ষণশীলতা এবং বাজার দর বেশি হওয়ায় দিনদিন কালোজিরা চাষে মোট জমির পরিমাণ ও বাৎসরিক মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অধীনস্থ মসলা গবেষণা কেন্দ্র হতে কালোজিরার একটি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে, যা বারি কালোজিরা-১ নামে পরিচিত। জাতটি ২০০৯ ইং সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধীত ও অবমুক্ত হয়। বারি কালোজিরা-১ জাতটি পরিপক্ক হতে ১৩৫-১৪৫ দিন সময় লাগে। গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি। প্রতিটি গাছে প্রায় ৫-৭টি প্রাথমিক শাখা এবং ২০-২৫টি ফল থাকে। এর প্রতিটি ফলের ভিতরে প্রায় ৭৫-৮০টি বীজ থাকে যার ওজন প্রায় ০.২০-০.২৭ গ্রাম । এ জাতটির প্রতি গাছে প্রায় ৫-৭ গ্রাম বীজ হয়ে থাকে এবং ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৩-৩.২৫ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ১ টন ।

মাটি ও আবহাওয়া

প্রায় সব ধরনের মাটিতে কালোজিরা চাষ করা যায়। তবে উঁচু ও মাঝারি উঁচু দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটি কালোজিরা চাষের জন্য উত্তম। তাছাড়া দেশের চরাঞ্চল ও ররেন্দ্র অঞ্চলও কালোজিরা চাষে উপযোগী। কালোজিরা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় জমির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভালো থাকতে হবে। শুস্ক ও ঠান্ডা আবহাওয়া কালোজিরা চাষের জন্য খুবই অনুকূল। মেঘাছন্ন আকাশ রোগবালাইয়ের জন্য অনুকূল। ফুল ফোটার সময় বৃষ্টি হলে কালোজিরার ফলন কমে যায় |

বপন সময়

মধ্য অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এর বীজ বপন করা হয়। তবে নভেম্বর মাসের প্রথম-দ্বিতীয় সপ্তাহ বীজ বপনের উত্তম সময় । বিলম্বে বীজ বপন করলে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফলন কমে যায় এবং আগাম বৃষ্টি হলে ফসল কর্তন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যাহত হয়।

জমি তৈরি

মাটির প্রকারভেদে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, সমতল জমির তুলনায় উঁচু বেড পদ্ধতিতে চাষ করলে কালোজিরার ফলন বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে বেডের প্রস্থ হবে ১.৫ মিটার আর দৈর্ঘ্য প্রয়োজনমত যেকোনো মাপের হতে পারে। বেডের উচ্চতা হবে প্রায় ৬ ইঞ্চি। পাশাপাশি দুটি বেডের মাঝে অবশ্যই ৫০ সেন্টিমিটারের চওড়া বিশিষ্ট গভীর নালা করে নিতে হয়। বেডগুলো উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বা করতে হয়। আর বেড করা সম্ভব না হলে জমিকে কয়েক ব্লকে ভাগ করে নিতে হবে। এজন্য জমিতে ৫০ সেন্টিমিটারের চওড়া বিশিষ্ট গভীর নালা করে এক ব্লক হতে অন্য ব্লক আলাদা করে নিতে হবে। প্রতিটি ব্লকের চারপাশ ৪০ সেন্টিমিটার চওড়া বিশিষ্ট আইল দ্বারা বেঁধে নিতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিতেই জৈবসারের ঘাটতি রয়েছে। তাই জমিতে জৈবসারবেশি পরিমাণ দেওয়া ভাল। নিম্নে হেক্টরপ্রতি জৈব ও অজৈব সারের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো-

সার	হেক্টরপ্রতি মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা	হিসাবে প্রয়োগ
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি
পচা গোবর	৫ টন	সব	-	-
ইউরিয়া	১৪০ কেজি	-	৭০ কেজি	৭০ কেজি
টিএসপি	১৫০ কেজি	সব	-	-
এমপিও	১২০ কেজি	সব	-	-
জিপসাম	৮৫ কেজি	সব	-	-
জিংক সালফেট	১০ কেজি	সব	-	-
বোরিক এসিড	৮ কেজি	সব	-	-

জমি তৈরির সময় শেষ চাষে সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংকসালফেট এবং বোরিক এসিড সার প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সার ২ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হয়। চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর ১ম কিস্তি এবং গজানোর ৪০-৫০ দিন পর ২য় কিস্তি সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণত আগাছা নিড়ানোর পর সার প্রয়োগ করতে হয়। তবে মাটিতে প্রয়োজনীয় রস না থাকলে সেচ দেওয়ার পরপরই ভেজা জমিতে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

বীজের হার

কালোজিরা সাধারণত দুই পদ্ধতিতে বপন করা হয় যেমন-ছিটিয়ে বপন এবং সারিতে বপন। গবেষণায় দেখা গেছে ছিটিয়ে বপন করার চেয়ে সারিতে বপন করলে কালোজিরার ফল বৃদ্ধি পায়। সারিতে বোনার ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ৮ কেজি এবং ছিটিয়ে বোনার ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। ছিটিয়ে বপন করলে অধিক বীজের প্রয়োজন হয় এবং সেই সাথে পরবর্তী আন্তঃপরিচর্যা বিশেষ করে নিড়ানিতে অধিক পরিমাণে শ্রমিক প্রয়োজন হয় যা উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করে।

বপন দূরত্ব

সারি থেকে সারি ৩০ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছ ৫ সেন্টিমিটার।

বীজ বপনের পূর্বে করণীয়

বীজ বপনের আগে কমপক্ষে ২ দিন বীজ রোদে শুকাতে হয়। এজন্য পূর্ণ রোদে বীজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শুকিয়ে ঠান্ডা স্থানে তুলে রেখে দিতে হয়। এভাবে ২য় দিন বীজ শুকিয়ে রাতের বেলায় পাস্টিকের পাত্রে নিয়ে পর্যাপ্ত পানিতে ১০-১২ ঘণ্টা ভিজে রাখতে হয়। বীজ সারা রাত (১০-১২ ঘণ্টা) ভিজানোর পর সকাল বেলা বীজ হতে পানি ফেলে দিতেহয়। অতঃপর ভেজা বীজগুলো প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম হারে কার্বোক্সি ও থিরাম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (প্রভ্যাঙ ২০০ ডব্লিউপি) দিয়ে মেখে নিতে হয়। প্রভ্যাঙ না থাকলে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (অটোস্টিন ৫০ ডব্লিউ ডি জি) দিয়ে শোধন করা যেতে পারে। শোধনকৃত বীজ অতঃপর চটের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে ছায়ায় রেখে এমন-ভাবে শুকিয়ে নিতে হবে যেন বীজগুলো ঝুরঝুরে হয়। বীজ ঝুরঝুরে না হলে বুনতে কষ্ট হবে এবং প্রয়োজনের তুলনায় অধিক বীজের প্রয়োজন হবে।

বীজ বপন পদ্ধতি

শোধনকৃত বীজ বপনের পূর্বে জমি প্রস্তুত করে নিতে হয়। তৈরিকৃত জমিতে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর রসি ধরে চিকন কঞ্চি দিয়ে অগভীর (১-১.৫ ইঞ্চি) দাগ টেনে সারি প্রস্তুত করতে হয়। এক সারি হতে আর এক সারির দূরত্ব হবে ৩০ সেন্টি-মটার। সম্ভব হলে প্রতিটি লাইনে প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (অটোস্টিন ৫০ ডব্লিউ ডি জি) এবং ৩ গ্রাম হারে কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক (সেভিন ৮৫ এসপি) মিশিয়ে লাইনের মাঝখানের গভীরত-ায় স্প্রে করে মাটি শোধন করতে হবে। তাহলে পরবর্তীতে চারায় গোড়া পচা রোগের প্রাদূর্ভাব কম হয় । অতঃপর প্রতিটি সারির মধ্যে শোধনকৃত বীজ অল্প পরিমাণে ক্রমান্বয়ে বুনতে হয়। বীজ বুনা হলে মাটি দিয়ে বীজ এমনভাবে ঢাকতে হবে যেন লাইনের ওপর বড় কোনো মাটির ঢিলা না থাকে ।

বীজ বপনের পর করণীয়

বীজ বপনের পরদিন হতে কমপক্ষে ৭ দিন পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস নিশ্চিৎ করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিদিন নালার মধ্যে পানি নিয়ে ছিটিয়ে জমি ভেজালে বীজ গজানোর হার বেড়ে যায় এবং দ্রুত চারা বের হয়। তবে বীজ বুনে ঢালাও সেচ প্রদান করলে মাটিতে শক্ত চটা বেঁধে যায়, যা চারা গজিয়ে বের হতে বাধা প্রদান করে এবং এতে চারায় গোড়া পচা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

আন্তঃপরিচর্যা

গাছের সঠিক বৃদ্ধি ও ফলন বাড়ানোর জন্য সময়মত আগাছা নিড়ানো ও চারা পাতলাকরণ অবশ্যই জরুরি। বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে প্রথম নিড়ানি দিতে হয়। চারার বয়স ২৫-৩০ দিনের হলে প্রতিটি সারিতে চারা পাতলা করে দিতে হয়। এক্ষেত্রে চারা গুচ্ছাকারে থাকলে পরপর একটি করে চারা রেখে প্রথমবার চারা পাতলা করে দিতে হয় অতঃপর চারার বয়স ৪০-৪৫ দিনের হলে দ্বিতীয় বার চারা পাতলা করতে হয়। এক্ষেত্রে এক চারা থেকে অপর চারা ৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রেখে চারা পাতলা করতে হয় ।

সেচ ও নিষ্কাশন

কলোজিরা ফসলে মাটির ধরন ও বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে ৪-৫টি হালকা সেচ প্রয়োগ করতে হয়। চারা গজানো, ফুল আসার আগে ও দানা গঠনের সময় সেচ দেওয়া আবশ্যক। এতে বীজ পুষ্ট ও ফলন বেশি হয়। চারা অবস্থায় প্রতি সেচের পরদিন কালোজিরা গাছের গোড়া ভিজিয়ে মাটিতে ২ গ্রাম/লিটার হারে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (অটে-াস্টিন ৫০ ডব্লিউ ডি জি) মিশিয়ে স্প্রে করলে গোড়াপঁচা রোগ এর প্রাদুর্ভাব কম হয়।

পোকামাকড়

কালোজিরার জমিতে তেমন একটা পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা যায় না। তবে কিছুকিছু অঞ্চলে ফল পরিপক্বের আগমুহূর্তে ফল ছিদ্রকারী পোকার প্রাদূর্ভাব দেখা যায়। এক্ষেত্রে আগাম সতর্কতা হিসেবে বীজ গঠনের মুহূর্ত হতে ফল পরিপক্বের আগ পর্যন্ত ১-২ বার কীটনাশক প্রয়োগ করলে ফল ছিদ্রকারী পোকার প্রাদুর্ভাব কমে যায়।

রোগবালাই

গোড়া পচা রোগঃ

মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় স্যাঁতসেঁতে ও আদ্র জমিতে এ রোগের প্রদুর্ভাব দেখা যায়। তাছাড়া অতিরিক্ত পরিমাণ বীজ বুনলে চারা অধিক ঘন হওয়ার ফলেও ছোট অবস্থায় গোড়া পচা রোগ দেখা দিতে পারে। অধিক পরিমাণে সেচ প্রদান করলে একাধারে চারা ও বড় গাছে এ রোগ ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। এ রোগের ফলে চারা ও গাছ হলুদ হয়ে ঢলে পড়ে এবং মারা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- রোগমুক্ত গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- বপনের পূর্বে প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (অটোস্টিন ৫০ ডবিউ ডি জি) মিশিয়ে প্রতি সারির মাঝের গভীরতায় স্প্রে করে মাটি শোধন করতে হবে।
- বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম হারে কার্বোক্সি ও থিরাম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (প্রোভ্যাঙ ২০০ ডব্লিউপি) অথবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (অটোস্টিন ৫০ ডব্লিউ ডি জি) দিয়ে শোধন করতে হবে।
- জমিতে অতিরিক্ত পরিমাণে সেচ প্রদান করা যাবে না।
- জমিতে বেড উঁচু রাখতে হবে এবং পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে ।
- রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই ২ গ্রাম/লিটার হারে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (অটোস্টিন ৫০ ডব্লিউ ডি জি) মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ২-৩ বার গাছের গোড়াসহ মাটিতে স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বীজ বপনের ১৩৫-১৪৫ দিনের মধ্যেই কালোজিরা সংগ্রহ করা যায়। এ সময় গাছ হলদে বর্ণ ধারণ করে এবং প্রতি গাছে এক থেকে দুইটি কালোজিরারক্যাপসুল (ফল) ফেটে উপর থেকে কালো দান দেখা যায়। সাধরণত ভোরবেলা অর্থাৎ সূর্যের আলোর প্রখরতা বৃদ্ধির পূর্বে হাত দিয়ে টেনে গাছ তুলতে হয়। সংগ্রহের পর গাছগুলো ১-২ দিন স্তূপাকারে রাখতে হয় এতে করে সমস্ত কেপসুল পরিপক্বতা লাভ করে এবং দানা কালো হয়। অতঃপর ২-৩ দিন ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে মাড়াই-ঝাড়াই করে বীজ পৃথক করতে হবে। অতঃপর আহরিত বীজ রোদে শুকিয়ে ৮-১০% আর্দ্রতায় পলিব্যাগে সিল করে ঢাকনাযুক্ত প্লাস্টিক ড্রামে বায়ুরুদ্ধ অবস্থায় রেখে সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন

সমস্ত পরিচর্যা সঠিকভাবে ও সময়মত করলে ফলন গড়ে হেক্টরপ্রতি ১.০-১.২ টন হয়ে থাকে ।

গোলমরিচ উৎপাদন প্রযুক্তি

ভূমিকা

গোলমরিচ Piper nigram বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় পাহাড়ের ঢাল থেকে পাহাড়ি সমতল ভূমিতে সাফল্যজনকভাবে চাষ করা যায়। প্রখর সূর্যালোক বা দীর্ঘ শুষ্ক আবহাওয়া বা দীর্ঘ খরায় গোলমরিচ গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভাইন এর অঙ্গজ বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। গোলমরিচকে বিশ্বের অন্যতম স্বাস্থ্যকর মসলা হিসেবে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এতে নানা ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে। সাধারণত জ্বর, সর্দি, গনোরিয়া ও পেট ফাঁপায় গোলমরিচ বেশ কার্যকর। তাছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য, রক্তসল্পতা, দাঁতের রোগ, ডায়রিয়া ও হৃদরোগেও গোলমরিচ উপকারী।

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অধীনস্থ সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর হতে গোলমরিচের একটি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে, যা বারি গোলমরিচ-১ নামে পরিচিত। জাতটির গাছ প্রতিবছর ফল দিয়ে থাকে। চারা রোপণের ৩-৪ বছর পর গাছ ফল দিতে শুরু করে। এই জাতটির ফল আমদানিকৃত বাজারের গোলমরিচের চাইতে বেশি ঝাল ও দানাগুলো সমআকৃতির।

মাটি ও আবহাওয়া

পানি নিষ্কাশনযুক্ত উচ্চমাত্রায় হিউমাসযুক্ত উর্বর দোঁ-আঁশ মাটি গোলমরিচ চাষের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। বেলে দোঁ-আঁশ ও এটেল দোঁ-আঁশ মাটিতেও গোলমরিচ চাষ করা যায়। অধিক বৃষ্টিপাত (২৫০০-৩০০০ মিলি) উষ্ণ ও আর্দ্র তথা জলীয় বাষ্পসমৃদ্ধ এলাকায় গোলমরিচ ভালো হয়। এটা ছায়া সহ্যকারী, কিন্তু প্রখর সূর্য তেজ সহ্য করতে পারে না। দিনের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫০ সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন ২৫০ সেলসিয়াস গোলমরিচের শাখা প্রশাখা বৃদ্ধির জন্য উত্তম। মাটির পিএইচ ৪.৫-৬.০ হলে গোলমরিচের উৎপাদন ভালো হয়।

জমি তৈরি

গোলমরিচের জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে ও পরে মই দিয়ে সমতল করতে হবে। জমির আগাছা বেছে ফেলতে হবে। মাটির ঢেলা ভেঙে ঝুরঝুরে ও সমান করে জমি তৈরি করতে হবে। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পিট তৈরি করা হয়। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধা আছে এমন জমি বেছে নিতে হবে।

বংশবিস্তার

গোলমরিচ সাধারণত ভাইন কাটিং থেকে বংশবিস্তার করে। কিন্তু বীজ থেকেও জন্মানো যায়। বীজ থেকে তৈরিকৃত চারার ফুল ও ফল আসতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়।

কাটিং

যেসব মাতৃগাছে ফলন বেশি ও ফুলের ছড়া ১৫-২০ সেমি.লম্বা এমন গোলমরিচের কাটিং সংগ্রহ করা হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাটিং থেকে গোলমরিচের চারা তৈরি করা হয়। বয়স্ক মাতৃগাছের গোড়ার দিক থেকে বেরিয়ে আসা ১-২ বছরের পুরাতন লতার অংশ থেকে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ২-৩টি পর্ব বিশিষ্ট ৪৫-৬০ সেমি. দীর্ঘ কাটিং সংগ্রহ করা হয়। ভাইনের উপরের ভার্টিকেল কাটিং এর চেয়ে হরাইজোন্টাল ভাইন কাটিং এর গাছে ফলন বেশি পাওয়া যায় ।

চারা নির্বাচন

একটি অধিক ফলনশীল ৫-১০ বছর বয়সের মাতৃগাছের ফলন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ১-৩ বছর পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে কাটিং/কলম করে চারা তৈরি করা উচিত। গোলমরিচ গাছ তিন ধরনের বায়বীয় মুকুল দেয়

- প্রাথমিক বা প্রধান মুকুল: লম্বা পর্বমধ্য ও বায়বীয় মূলযুক্ত, অবলম্বন বেয়ে উপরে ওঠে
- ধাবক মূল: এগুলো ঝাড়ের গোড়া থেকে উৎপন্ন, পর্বমধ্য লম্বা এবং মাঝে মাঝে বায়বীয় মূল দেখা যেতে পারে
- পার্শ্বীয় ধাবক মুকুল: এই মুকুল কাটিং এর জন্য উত্তম, সীমিত বৃদ্ধিযুক্ত, ফল উৎপাদক চারা তৈরি

চারা তৈরি

এপ্রিল-মে মাসে দুই তিনটি পর্বযুক্ত ধাবক মুকুল গাছ থেকে কেটে নেওয়া হয় এবং পলিথিন প্যাকেটে মাটির মিশ্রণে লাগানো হয়। নার্সারিতে প্যাকেটের ওপর যাতে রোদ না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং নিয়মিত পানি দিতে হবে। কাটিং পরবর্তী বছর মে-জুন মাসে জমিতে লাগানোর উপযোগী হয়ে যায়। তাছাড়াও ঝাড় থেকে লম্বালম্বি ৭৫ সেমি. গভীর ও ৩০ সেমি. চওড়া নালা কেটে ঐ নালাতে মাটি, বালি ও পাতা পচা বা গোবর সারের মিশ্রণ (১ :১ : ১) ভরে দিতে হবে। ধাবকগুলোকে ঐ নালার মিশ্রণের ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ছোট ছোট খুঁটি দিয়ে ধাবকগুলোকে ২-৩টি পর্ব অঞ্চল পর্যায়ক্রমে উঁচু করে দিতে হবে। ঝাঁঝরির ২৫০ লিটার পানিতে ১ কেজি ইউরিয়া, ১ কেজি সুপার ফসফেট, ১ কেজি এমপি, ৭৫০ গ্রাম ম্যাগনোসিয়াম সালফেট মিশিয়ে প্রতি ঝাড়ে ১৫ দিন পরপর ১ লিটার করে প্রয়োগ করতে হবে। ধাবক মুকুলের শীর্ষভাগ কেটে দিতে হবে। ৪ মাস বয়সি চারার ডগা নিচ থেকে ৩টি গিঁট উপরে ছেঁটে দিতে হবে। ১০-১৫ দিন পরে মুকুলযুক্ত প্রতিটি চারা অংশ আলাদা করতে হবে যাতে প্রতিটি অংশেই কিছু পরিমাণ মূল থাকে। এখন এক একটি অংশ প্রতিটি প্যাকেটে বসাতে হবে এবং অধিক আর্দ্রতাযুক্ত ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে। তিন সপ্তাহ এইভাবে রাখার পরে ঐ প্যাকেট রোদ ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। দুই-আড়াই মাসে চারা মূল জমিতে বসানোর উপযোগী হয়ে থাকে।

রোপন

চৈত্র-বৈশাখ মাসে কাটিং পলিথিন ব্যাগের মাটিতে বসিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে পরিমিতভাবে পানি দিলে এক মাসের মধ্যে কাটিং থেকে শিকড় বের হতে শুরু করবে এবং জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে লাগানোর উপযুক্ত হবে। গোলমরিচ লতা জাতীয় গাছ। তার জন্য আশ্রয়দাতা যেমন আম, কাঁঠাল, সুপারি, মান্দার, জিকা, সাজিনা, শিমুল, আমলকী ইত্যাদি গাছ দীর্ঘস্থায়ী খুঁটি এর বাউনি হিসাবে দেওয়া প্রয়োজন। গোলমরিচ এর চারা ৩.০ মি. দূরত্বে সারি করে ৬০ সেমি চওড়া সেমি গভীর করে তৈরি মাদায় লাগানো হয়।

বাগান স্থাপন

জুন-জুলাই মাসে মূল জমিতে বাউনি/অবলম্বনকারী গাছের সাথে দুই তিনটি গোলমরিচের চারা নালার (১৫ সেমি. চওড়া ও গভীর) ভিতরে এমনভাবে বসিয়ে দিতে হবে যেন ডগাটিকে অবলম্বনের সাথে বেঁধে দেওয়া যায়। এরপর নালার ভিতরে লতার ওপর মাটি চাপা দিতে হবে। নেমাটোড এর হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রতিটি মাদাতে ৩০ গ্রাম হারে কার্বোফুরান-৫ জি প্রয়োগ করতে হবে। চারা থেকে চারা ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ২.৫x২.৫ মিটার হতে হবে।

সারের পরিমাণ

প্রতিটি তৈরিকৃত পিট/গর্তে ৫-১০ কেজি গোবর সার, ১১৫ গ্রাম টিএসপি ও ১১৫ গ্রাম এমপি দিয়ে ঝুরঝুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

প্রতিবছর বর্ষার শুরুতে (এপ্রিল-মে) ও বর্ষা শেষে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) গোলমরিচ গাছের গোড়া থেকে ৩০ সেমি, দূরত্বে ও ১৫ সেমি. গভীরতায় ঝাড়প্রতি ১০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৪০ গ্রাম ফসফেট ও ১৪০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথম বছরে ঐ সারের তিন ভাগের একভাগ, দ্বিতীয় বছর তিনভাগের দুইভাগ পরিমাণ ও তৃতীয় বছরে পুরোমাত্রায় সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আন্তঃপরিচর্যা

গাছ কিছুটা বড় হলে গাছের গোড়ার চারিদিকে হালকাভাবে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। তাছাড়া গাছের চারিদিকে মাটি দিয়ে ভেলি বেঁধে দিতে হবে। প্রধান লতা ৩ মিটার ওপরে বেশ ঝাঁকড়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে লতাগুলোকে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ থেকে ছড়িয়ে নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের গোড়ায় মাটি চাপা দেওয়া হয়। এতে প্রচুর শাখা ও মূল বের হয়।

পোকামাকড়

ফ্রি বিটল পোকা

এই জাতীয় পোকা গোলমরিচের প্রধান শত্রু। এই পোকার আক্রমণে গোলমরিচের দানা ফাঁপা হয়ে যায় ও ব্যাপক ক্ষতি করে।

দমন

প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার কুইনালফস যেমন-একালাকস/কিনালক্স/দেবীলাক্স ২৫ ইসি ভালোভাবে মিশিয়ে ৭-১৫ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।

রোগবালাই

গোড়াপচা রোগ

এ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পাতা হলুদে হয়ে যায় ও পরে গাছের মূল পচে যাওয়ায় গাছ মারা যায় । গাছের গোড়ায় জমে থাকলে এ রোগ হতে পারে।

দমন

প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে অটোস্টিন গাছের গোড়ায় মাটিতে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায় ।

ফলন

প্রতি গাছে ৫-১০ কেজি কাঁচা গোলমরিচ সংগ্রহ করা যায়। গাছপ্রতি গড়ে ফলন ১.৪৫ কেজি শুকনা গোলমরিচ।

তেজপাতা উৎপাদন প্রযুক্তি

ভূমিকা

তেজপাতা Cinnamomum tamala, family: Lauraceae) বাংলাদেশের বহুল ব্যবহৃত একটি মসলা ফসল। বিভিন্ন ধরণের রান্নায় স্বাদ ও সুগন্ধি বাড়ানো ছাড়াও এর রয়েছে মূল্যবান ঔষধি গুণাগুণ। এতে প্রচুর পরিমাণে খনিজ ও ভিটামিন রয়েছে যা ক্ষত সারানো, ডায়াবেটিস-২ উপশম ও রেচনের জন্য উপযোগী। এতে অবস্থিত চিনো, শরিক এসিড ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

জাত পরিচিতি

তেজপাতার বিভিন্ন জাত এদেশে চাষ হয়, তবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত বারি তেজপাতা-১ জাতটি ২০১৩ সালে অনুমোদিত হয়েছে। তেজপাতার জাতটি তুলনামূলকভাবে অন্য তেজপাতার জাতের তুলনায় দ্রুতবর্ধনশীল, অধিক সংখ্যক বল্লমাকার কিছুটা চওড়া ও সুগন্ধযুক্ত পাতা এবং রোগবালাই সহনশীল জাত।

আবহাওয়া ও মাটি

সাধারণত উষ্ণ ও অবউষ্ণ আবহাওয়া তেজপাতা চাষের জন্য উপযোগী। সুনিষ্কাশিত উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়। পাহাড়ের ঢালে ও উপরে ভাল বায়ু চলাচল উপযোগী ও পর্যাপ্ত সূর্যালোকে এর উৎপাদন ভাল হয়।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়

সমতল ভূমিতে তেজপাতার চারা সাধারণত বর্গাকার বা ষড়ভুজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ে কন্টর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত তেজপাতার চারা রোপণ করা যায়।

মাদা তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৪-৬ মি.দূরে দূরে ৬০দ্ধ৬০দ্ধ৬০ সেমি. ২ ফুট গভীর করে গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ৫-১০ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ১-২ কেজি ছাই, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা

এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত তেজপাতা চারাকলম রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারাকলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চারার গোড়ার মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপর খুঁটি দিয়ে চকলমটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমত পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সারপ্রয়োগ

গুণগত মানসম্পন্ন ফলন পেতে হলে তেজপাতায় নিয়মিত পরিমিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বৃদ্ধির সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। প্রতিটি গাছের জন্য ৪/৫ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমকপি ও ১০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। সবটুকু সার তিন ভাগ করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র-আশ্বিন ও মাঘ ফাল্গুন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার দেওয়ার পর প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।

আগাছা দমন ও সেচ

গাছের গোড়া নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে লাগানো গাছের গোড়ায় আগাছা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে। চারা রোপণের প্রথম দিকে প্রয়োজনমত সেচ দেয়া দরকার। গাছ বড় হয়ে গেলে আর সেচের তেমন প্রয়োজন পড়ে না ।

ডাল ছাঁটাইকরণ

চারা অবস্থায় গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য অবাঞ্চিত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে রাখতে হবে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে ।

ক্ষতিকর রোগ ও পোকামাকড় এবং দমন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ তেজপাতায় পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ তেমন পরিলক্ষিত না হলেও বর্তমানে তেজপাতা চাষ সম্প্রসারণের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। এসব পোকামাকড় ও রোগের কারণে তেজপাতা উৎপাদনে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। নিম্নে বাংলাদেশের তেজপাতার প্রধান প্রধান ক্ষতিকারক পোকামাকড় ওরোগের সম্ভাব্য দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ইরিওফাইড মাইট Eriophyes boisi

ইরিওফাইড মাইট নামক এক প্রকার মাকড় প্রধানত কচি তেজপাতায় গলের সৃষ্টি করে। শীতের শেষে এবং বসন্তের শুরুতে অর্থাৎ যখন গাছে নতুন পাতা গজাতে/আসা শুরু করে তখনই সাধারণত নতুন কচি পাতায় এই মাকড়ের আক্রমণ শুরু হয়।

ক্ষতির প্রকৃতি

- আক্রান্ত পাতার নিচের দিকে নিম্নমুখী গর্তের সৃষ্টি হয় যার মধ্যে মাকড় অবস্থান করে।
- কচি পাতার নিচের দিকে ছোট চিকন বা লম্বাটে ধরনের হালকা সবুজ বা লাল রঙের গল বা বাড়তি অংশ দেখা যায়। যা পরে সবুজ রং ধারণ করে এবং গল-এ রূপান্তরিত হয়।
- আক্রমণ বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং পাতা কোঁকড়ানো ও আকারে ছোট হয় ও পাতার রং নষ্ট হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- তেজপাতা বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।প্রতিটি গাছের চারপাশে বড় বৃত্তাকার তৈরি করে আগাছা নিড়ানোর পর প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার ও পানি দিতে হবে।
- নিম তৈল প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি. হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর অন্তর ৩-৪ বার পুরো গাছের পাতা ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- আক্রমণ শুরুর আগে অর্থাৎ শীতের শেষ দিক হতে বসন্তের শুরুর দিকে মাকড়নাশক যেমন ভার্টিমেক (অ্যাবমেকটিন) ১.৮ ইসি প্রতি ১.২ মিলি. হারে অথবা টলস্টার (বাইফেনথ্রিন) ২.৫ ইসি ১ মিলি. হারে অথবা ইনট্রিপিড (ক্লোরফিনাপির) ১০ ইসি ১ মিলি. হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে এবং কীটনাশক তথা সাকসেস (স্পিনোসেড) ১.২ মিলি. হারে অথবা টাফগর (ডাইমেথয়েড) ৩ মিলি. হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রো করে গাছের পাতা ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

প্যাস্টালোশিয়া ব্লাইট/গ্রে লিফস্পট

Pestalotia cinnamomi নামক ছত্রাকের কারণে তেজপাতায় এই রোগ দেখা দেয়। প্রথমে পাতার টিপ বা উপরের অংশ হতে হালকা হলদে বাদামি বর্ণ ধারণ করে যা পরে দুই ধার হতে বাড়তে বাড়তে নিচের দিকে নেমে আসে এবং পরে ধূসর বর্ণ ধারণ করে। আস্তে আস্তে পুরো পাতা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয় এবং ঝরে পড়ে।

প্যাস্টালোশিয়া ব্লাইট আক্রান্ত গাছ

দমন ব্যবস্থাপনা

- বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে বাগানে পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও বাতাস প্রবেশ করতে পারে।
- পাতা সংগ্রহের পর প্রতিবছর কমপক্ষে একবার গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় সার ও সেচ দিতে হবে।
- আক্রমণের শুরুতে বোর্দ মিশ্রর ২ মিলি. হারে ১০-১২ দিন পরপর ৩-৪ বার দিতে হবে।
- আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে কপার ফানজিসাইড যেমন- কুপ্রাভিট/সানভিট ৩ গ্রাম হারে অথবা টিল্ট (প্রপিকোনাজল) ১ মিলি. হারে অথবা অটোস্টিন (কার্বেন্ডাজিম) ২ গ্রাম হারে অথবা ম্যানকোজেব ২ গ্রাম হারে ১২-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এই রোগ দমন করা যায়।

ফসল সংগ্রহ, শুকানো ও ফলন

চারা লাগানোর ৪/৫ বছর পর থেকে শীতকালে পাতা সংগ্রহ করা যায় এবং একটি গাছ থেকে ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে। স্বাস্থ্যবান ও কম বয়সি গাছ থেকে প্রত্যেক বছর পাতা সংগ্রহ করা গেলেও রুগ্ন ও বেশি বয়সি গাছ থেকে এক বছর অন্তর পাতা সংগ্রহ করা উচিত। বৃষ্টিতে পাতার সুগন্ধ নষ্ট হয়ে যায় বিধায় অক্টোবর-মার্চ মাস পর্যন্ত পাতা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ৪-৬ মাস বয়সি পরিপক্ব কিন্তু সতেজ পাতার গুণগতমান সবচেয়ে ভালো হয়। কচি পাতার ওজন কম এবং পাকা পাতার গুণগত মান খারাপ হয়। এজন্য ছোট গাছের আগার কচি পাতা বাদে ৪-৬ মাস বয়সি সবুজ মচমচে পাতাগুলো উপর থেকে নিচের দিকে চাপ দিয়ে ভেঙে সংগ্রহ করা ভাল। বড় গাছের ক্ষেত্রে ছোট ছোট শাখা কেটে নিয়ে পাতা সংগ্রহ করা যায়। পাতা সংগ্রহের পর তেজপাতা প্রথম অবস্থায় প্রতিবছর হেক্টরপ্রতি ১৫০-৫০০ কেজি এবং পরবর্তীতে ৩০০০-৪০০০ কেজি পর্যন্ত শুকনা পাতা পাওয়া যেতে পারে।

তেজপাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ

সাধারণত দুই পদ্ধতিতে তেজপাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়ে থাকে। প্রথমত সরাসরি সূর্যালোকে শুকানো দ্বিতীয়ত ওভেনে শুকানো। গাছ থেকে পাতা তোলার পর ৩-৪ দিন ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে বিক্রয়ের জন্য বস্তায় ভরা হয়। সরাসরি সূর্যালোকে ২ দিন শুকিয়েও বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা যায়। ওভেনে ৪০ক্ক সে. তাপমাত্রায় একদিন শুকিয়ে বাজারজাত করা যায়।

দারুচিনি উৎপাদন প্রযুক্তি

ভূমিকা

দারুচিনি (Cinnamomum zeylanicum, family: Lauraceae) বাংলাদেশের বহুল ব্যবহৃত একটি মসলা ফসল। দারুচিনি চিরহরিৎ বহুবর্ষী বৃক্ষজাতীয় ফসল। বিভিন্ন ধরণের রান্নায় স্বাদ ও সুগন্ধি ছড়ানো ছাড়াও এর রয়েছে মূল্যবান ঔষধি গুণাগুণ। দারুচিনি মসলা হিসেবে, ঔষধ শিল্প, বেভারেজ, পারভিউম, কসমেটিক্স ও সাবান প্রস্তুতিতে বহুল ব্যবহৃত হয়। এতে যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ ও ভিটামিন রয়েছে যা দেহকোষের সুরক্ষার জন্য উপযোগী। এতে অবস্থিত ইউজেনল, চিনামিক এসিড, চিনামালডিহাইডসহ উদ্বায়ী ও অত্যাবশকীয় তেল ও ভিটামিনসমূহ শ্বেতসার মেটাবলিজম, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। দারুচিনি জীবাণুনাশক, রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধী ও ব্যথানাশক। বাকলে থাকা (মোট ওজনের ০.৫-১.০ % পর্যন্ত) চিনামালডিহাইড, চিনামিক এ্যাসিটেট, চিনামাইল এ্যালকোহল ও আরো কয়েকটি উদ্বায়ী তেলের সুগন্ধ, মিষ্টতা ও ঝাঁঝের জন্য দায়ী।

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত বারি দারুচিনি-১ জাতটি Cinnamomum zeylanicum বা চিনামোন। এ জাতটির বাকল আকর্ষণীয় বাদামি রঙের সুগন্ধযুক্ত, মিষ্টি ও মধ্যম ঝাঁঝযুক্ত, মধ্যম পুরু (৩.৪ মি.মি.), আপেক্ষিক ওজন ১১.৬৭ গ্রাম/১০০ বর্গসেমি.। জাতটির গাছের বৃদ্ধির হার ও ফলন ভালো (৭১৪ গ্রাম/গাছ, ৩৮৫ কেজি/হে.) এবং পোকামকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ সহনশীল। বারি দারুচিনি-১ এ উদ্বায়ী তেলের পরিমাণ ৪.৭০ মিলি/১০০ গ্রাম।

আবহাওয়া ও মাটি

সাধারণত উষ্ণ ও অবউষ্ণ আবহাওয়া দারুচিনি চাষের জন্য উপযোগী।

বংশবিস্তার

দারুচিনির বংশবিস্তার সাধারণত দুই পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। যথা - (১) যৌন বংশবিস্তার বা বীজ থেকে চারা উৎপাদনের মাধ্যমে ও (২) অযৌন বংশবিস্তার বা কলমের মাধ্যমে। নার্সারিগুলোতেও এ দুটি পদ্ধতিরইকমবেশি ব্যবহার দেখা যায়। তেজপাতা ও দারুচিনির মাঝামাঝি একটি স্পেসিস কাবাব চিনি বা কেসিয়া (Cinnamomum cassia) গাছের ওপর কলম করলে সাফল্য ও বৃদ্ধির হার ভালো হয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এসব কারণে কাবাব চিনির রুটস্টকের ওপর জোড়কলম পদ্ধতিই দারুচিনির বংশবিস্তারের ভালো উপায় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

জমি তৈরি

যে জমিতে অন্য ফসল ভালো হয় না সে জমি দারুচিনি চাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভালো করে চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। পাহাড়ি এলাকা, বাড়ির আঙিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে জমিতে চাষ না দিয়ে শুধু পরিষ্কার করে নিলেই চলবে।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়

সমতল ভূমিতে দারুচিনি চারা সাধারণতঃ বর্গাকার বা ষড়ভুজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে কিন্তু উঁচুনিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করা উত্তম। বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস বা মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দারুচিনির চারা বা কলম রোপণ করা যায়।

মাদা তৈরি

চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে উভয় দিকে ১ মি.দূরত্বের সারিতে ৬০ সেমি.দূরে দূরে ৩০ঘ৩০ঘ৩০ সেমি. মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ৪-৫ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ১২ কেজি ছাই, ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১২ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা

এক বছর বয়সি সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত দারুচিনি চারা/কলম রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১২ দিন পর চারা/কলমটি মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চারার গোড়ায় মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপর খুটি দিয়ে চারা/কলমটি বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমত পানি ও বেড়ার ব্যবহার করতে হবে।

সারপ্রয়োগ

গুণগত মানসম্পন্ন দারুচিনি পেতে হলে দারুচিনি চাষে নিয়মিত ও পরিমিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। ৩/৪ বছরের প্রতিটি গাছের জন্য বছরে ৪/৫ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমওপি ও ১০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। সবটুকু সার তিন ভাগ করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র-আশ্বিন ও মাঘ-ফাল্গুন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার দেওয়ার পর প্রয়োজনমত পানি দিতে হবে।

আগাছা দমন ও সেচ

গাছের গোড়া নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে, বাড়ির আঙিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে লাগানো গাছের গোড়ায় আগাছা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে। চারা রোপণের প্রথম দিকে প্রয়োজনমত সেচ দেওয়া দরকার। গাছ বড় হয়ে গেলে আর সেচের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

ডাল ছাঁটাইকরণ

চারা অবস্থায় গাছকে সুন্দর সোজা কাঠামো দেওয়ার জন্য অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে রাখতে হবে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড় আক্রান্ত শাখা ডালপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

ক্ষতিকর রোগ ও পোকামাকড় এবং দমন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে দারুচিনি চাষাবাদে তেমন কোনোক্ষতিকর রোগ এবং পোকামাকড় পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে কিছু জায়গায় নিম্নোক্ত পোকার আক্রমণ দেখা গেছে-

দারুচিনির কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা

লক্ষণ

- কান্ড ছিদ্রকারী পোকার কীড়া গাছের কাণ্ড ছিদ্র করে এবং আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ করে বাকল খেতে থাকে।
- ছিদ্রের মুখে কালচে বাদামি চাপাতির গুঁড়োর মত দানা দানা কীড়ার মতো দেখা যায়।
- ফলে গাছে খাদ্য ও পানি চলাচল ব্যাহত হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ছিদ্রমুখের মল পরিষ্কার করে পেট্রোল/কেরোসিন তেল বা ক্লোরোফর্ম এক টুকরো তুলায় ভিজিয়ে ছিদ্রের মুখে ঢুকিয়ে ছিদ্রের মুখ নরম কাদা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এতে কীড়া মারা যাবে।
- আক্রান্ত গাছের কাণ্ডেপ্রতি লিটার পানিতে ৩ মিলি. পরিমাণ নিমবিসিডিন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- আলোক ফাঁদে এ পোকার মথকে আকৃষ্ট করে মেরে ফেলা যায়। খেত ও গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার রাখতেহবে।

ফসল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

স্বাভাবিক অবস্থায় ২ বছর বয়সি দারুচিনি গাছের উচ্চতা ১০-১৫ ফুট বা ৩-৫ মিটার এবং ব্যাস ২ ইঞ্চি বা ৫ সেমি. এর মতো হলেই এর বাকল সংগ্রহের উপযোগী হয়। দারুচিনি সংগ্রহকারীগণ সকাল বেলায় এমনভাবে ডাল/শাখা সংগ্রহ করেন যাতে পরবর্তী প্রক্রিয়া দিনের মধ্যেই সম্পন্ন করা যায়। সংগৃহীত শাখাগুলোপ্রক্রিয়াজাতকরণের স্থানে দেওয়া হয় এবং নিম্নোক্ত ধাপগুলো সম্পন্ন করা হয়। দারুচিনি প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপগুলি নিম্নরূপ-

শাখা কর্তন ও সংগ্রহ ⟶ পরিবহণ ⟶ ধৌতকরণ ⟶ গিঁট ছাড়ানো ⟶মৃতকোষ ও বহিঃত্বক ছাড়ানো ছাল নরম করা ⟶ ছাল ছাড়ানো ⟶ ছায়াতে শুকানো ⟶কুইল তৈরি ⟶কুইল সাজানো বান্ডেল তৈরি ⟶ প্যাকিং

ধাপ-১:

দারুচিনি শাখা সংগ্রহ

সাধারণত বর্ষা মৌসুমের শেষ দিকে বা শরৎ-হেমন্তকালে (আগস্ট-নভেম্বর) ভোরবেলা (৫.৩০ থেকে ৭.৩০টার মধ্যে) দারুচিনির শাখা সংগ্রহ করা হয়। গাছে ফুল-ফল থাকলে বা কচি পাতা গজানোর সময় (২/৩ মাস) দারুচিনি সংগ্রহ করলে এর গুণগত মান ভালো হয় না। আবার অতিরিক্ত শুকনা আবহাওয়ায় মাটির আর্দ্রতা কমে গেলে শাখা থেকে ছাল ছাড়ানো কঠিন হয়ে যায়। তাই ডাল বা শাখা নির্বাচনের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অনুপযুক্ত এবং কচি শাখাগুলি না কেটে পরবর্তী সময়ে সংগ্রহের উপযোগী হওয়ার জন্য রেখে দিতে হবে। সাধারণত সংগ্রহকারীগণ একটু বাকল কেটে ছাল সংগ্রহের উপযোগিতা পরীক্ষা করেন। ছাল তুলতে কোন সমস্যা মনে হলে সেটা বাদ দেওয়া হয়। সংগ্রহের পর ছোট শাখা ও পাতাগুলো ছাঁটাই এরপর লাঠির মতো করে আঁটি বেঁধে পরিষ্কার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। দারুচিনির ছাঁটাইকৃত ডালপালা ও পাতাগুলো গাছের গোড়ায় জাবড়া হিসেবে প্রয়োগ করা যায়। দারুচিনির শাখা সংগ্রহ সাধারণত একটি ধারালো ছোট আকারের দা এর সাহায্যে করা হয়ে থাকে।

ধাপ-২: গিঁট ছাড়ানো

ভালোভাবে ছাল ছাড়ানোর সুবিধার্থে দারুচিনির শাখাগুলো সমান করে নেওয়ার জন্য শাখার গিঁটগুলো কেটে সমান করে নিতে হবে। এক হাতে শাখাটি ধরে অন্য হাতে ধারালো দা দিয়ে গিঁট, সংলগ্ন ছোট শাখা বা স্ফীত অংশ কেটে সমান করে নিতে হয়।

ধাপ-৩: স্ক্র্যাপিং বা ছাল পরিষ্কার করা

মানসম্মত দারুচিনি পেতে দারুচিনির শাখার বাকলের উপরের মরা কোষ এবং বাইরের নরম কর্কযুক্ত এপিডার্মিস স্তরটি বিশেষভাবে তৈরি বাঁকানো ধারালো ছুটি বা ছোট দা এর সাহায্যে চেঁছে উঠিয়ে ফেলে দিতে হবে। দারুচিনিরগুণগতমান বৃদ্ধির জন্য এই ধাপটি সময়সাপেক্ষ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাণ্ড সোজা ও মসৃণ হলে বাকল পরিষ্কার করা ও ছাল ছাড়ানো সহজ হয়।

ধাপ-৪: রাবিং বা ঘষে ছাল নরম করা

পরিষ্কার করার পর ছালের ভিতরের পরিবাহী তন্তুসহ হলুদাভ অংশটি পিতলের দণ্ড দিয়ে ঘষে নরম করা হয়, যাতে ছাল সহজে সুন্দরভাবে ছাড়ানো যায়। তবে না ঘষেও ভালোভাবে ছাল উঠানো গেলে এটি অত্যাবশ্যক নয়।

ধাপ-৫: ছাল ছাড়ানো

দারুচিনি প্রক্রিয়াজাতকরণের এই ধাপটিতে সবচেয়ে বেশি শ্রম, দক্ষতা ও সময় লাগে। স্ক্র্যাপিংয়ের পর একটি ধারালো ছুরি ও একটি ভোঁতা বাঁকানো কোটাহ এর সাহায্যে সাবধানে শাখা থেকে দারুচিনির ছাল আলাদা করা হয় যেন ছালগুলো আস্ত, ফাটাবিহীন ও সুন্দর থাকে। ধারালো ছুরি দিয়ে প্রথমে বাকলের নির্দিষ্ট অংশে লম্বালম্বিভাবে দুটি বা শাখা মোটা হলে তিন বা চারটি দাগ দিয়ে যথাসম্ভব লম্বা ফালির মতো করে বাকল কেটে দেওয়া হয়। এরপর ছুরির আগা বা বাঁকানো ছুরি বা ছোট দা দিয়ে এক পাশ থেকে আস্তে আস্তে ছাল ছাড়ানো বাকল ক্রমান্বয়ে তুলে যেতে হবে। গিঁটের কাছের বা অন্য সম্পূর্ণ বাকল তোলা হয়ে গেলে তা ডাল থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়। অবশ্য ডাল সংগ্রহ ও ছাল ছাড়ানো একই দিনে বা যথাশীঘ্রই হতে হবে। দেরি হলে ছাল শুকিয়ে যাবে এবং ছাড়ানো সম্ভব হবে না।

ধাপ-৬: কুইল তৈরি ও বাকল শুকানো

আলাদা করে বাকলগুলো ২/৩ ঘণ্টা পাতলা করে ছায়াতে ছড়িয়ে রাখার পর তা শুকিয়ে লম্বালম্বিভাবে বাঁকা হয়। এ বাকলগুলো একটির খাঁজে অন্যটি ঢুকিয়ে খালি জায়গা পূরণ করা হয়। এতে কম জায়গায় বেশি দারুচিনি রাখা সম্ভব হয়। এরপর ঘরের ছাউনির নিচে আলো বাতাস চলাচল উপযোগী মাচায় পাতলা করে বিছিয়ে রেখে ৭-৮ দিন শুকানো হয়। এরপর আঁটি বেঁধে বা বায়ুরোধী পলিব্যাগে বাজারজাত করা হয়। কারখানায় দারুচিনির পাউডার তৈরি করে দারুচিনির তেল নিষ্কাশন করে উচ্চ মূল্যের সামগ্রী হিসেবেও বাজারজাত করা যায়।

ফলন

দারুচিনির প্রথম অবস্থায় প্রতিবার কর্তনে হেক্টরপ্রতি ১৫০ কেজি থেকে ৩০০ কেজি এবং পরবর্তীতে ৩০০-৫৫০ কেজি পর্যন্ত শুকনা দারুচিনি ছাল (কুইল) পাওয়া যায়।

বারি জিরা-১ উৎপাদন প্রযুক্তি

ভূমিকা

জিরা আমাদের প্রতিদিন ব্যবহারের একটি সুগন্ধি ও সুস্বাদু মসলা উপাদান। জিরা **Apiaceae** পরিবারভুক্ত বর্ষজীবী বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ যার বৈজ্ঞানিক নাম Cuminum cyminum L ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জিরার আদি নিবাস। এটি মিশর সিরিয়া, ইরান, তুরস্ক, ভারত, মরোক্কো, চায়না, দক্ষিন রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও জাপানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়ে থাকে। বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৭০ ভাগের অধিক জিরা ভারতের গুজরাট, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশে চাষ হয়। বাংলাদেশ ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ হলেও জিরা চাষাবাদ হয় না। যার জন্য প্রতিবছর বাংলাদেশে ২৭০০০-২৮০০০ টন এর অধিক পরিমাণ জিরা আমদানি করতে হয়।

জিরা ঔষধ, বেকারী, রন্ধনশিল্প ও প্রসাধনী সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এটি উত্তেজক, বায়ুনাশক, ক্ষুধাবর্ধক হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখে এবং শরীরের উষ্ণতা কমায়। জিরা চূর্ণ মাতৃদুগ্ধ বৃদ্ধি ও ক্ষতস্থান দ্রুত শুকাতে সাহায্য করে। জিরার পুরাতন গুঁড়া মিশিয়ে সকালে বা রাতে তিন সপ্তাহ খেলে পুরনো আমাশয় রোগ সেরে যায়। সমপরিমান ধনিয়া ও জিরার গুঁড়া একটু চিনির সাথে মিশিয়ে খেলে অম্লজনিত বুক জ্বালা উপশম হয়। মেয়েদের শ্বেতপ্রদাহ ও রক্তপ্রদাহ রোগে পরিমাণমতো জিরা গুঁড়া ও চিনি ভাতের মাড়ের সাথে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। ঠান্ডাজনিত জ্বর বা ম্যালেরিয়ায় এক চা চামচ জিরা গুঁড়া ২ চা চামচ করলার রসে মিশিয়ে নিয়মিত খেলে উপকার পাওয়া যায়। জিরায় বিদ্যমান উদ্বায়ী তেল (কিউমিন এলডিহাইড) সংশ্লিষ্ট এনজাইমকে সক্রিয় ও উজ্জীবিত করে হজমশক্তি এবং বায়ুনাশ করে ক্ষুধা বাড়ায়। হিঁচকি থামানোর জন্য ভিনেগারের সাথে জিরা মিশিয়ে খেলে হিচকি থেমে যায়। নিয়মিত জিরা খেলে পাকস্থলী বা মূত্রাশয়ে রক্ত বা পাথর জমলে তা বেরিয়ে যায়।

ইউএসডিএ (২০১৭) এর তথ্যানুযায়ী প্রতি ১০০ গ্রাম জিরার বীজে ৩৭৫ কিলোক্যালরি শক্তি, ৪৪.২৪ গ্রাম শর্করা, ২.২৫ গ্রাম চিনি, ১০.৫০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য আঁশ, ২২.৭০ গ্রাম চর্বি, ১৭.৮১ গ্রাম আমিষ, ১২৭০ আইইউ ভিটামিন এ. ০.৬৩ মি. গ্রাম ভিটামিন বি১, ০.৩৩ মি.গ্রাম ভিটামিন বি২, ৪.৫৮ মি.গ্রাম ভিটামিন বি৩, ০.৪৪ মি.গ্রাম ভিটামিন বি৬, ১০ মাইক্রো গ্রাম ভিটামিন বি৯, ২৪.৭০ মি.গ্রাম কোলিন, ৭.৭০ মি.গ্রাম ভিটামিন সি, ৩.৩৩ মি.গ্রাম ভিটামিন ই, ৫.৪০ মাইক্রো গ্রাম ভিটামিন কে, ০.৯৩১ মি.গ্রাম ক্যালসিয়াম, ৬৬.৩৬ মি. গ্রাম লৌহ, ০.৯৩১ মি.গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ৩.৩৩ মি.গ্রাম ম্যাঙ্গানিজ, ০.৪৯৯ মি.গ্রাম ফসফরাস, ০.১৭৮৮ মি.গ্রাম পটাসিয়াম, ০.১৬৮ মি.গ্রাম সোডিয়াম, ৪.৮০ মি.গ্রাম জিঙ্ক এবং ৮.০৬ গ্রাম পানি বিদ্যমান। পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ ও উচ্চ মূল্যের এই মসলা ফসল বাংলাদেশে চাষাবাদ করার সম্ভাবনা নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি চিত্র-১ : বারি জিরা-১ এর মাঠ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বগুড়া ২০০১ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে সংগৃহীত জার্মপাজম নিয়ে গবেষণা চালিয়ে আসছে। যার ফলশ্রুতিতে, আমাদের দেশে চাষাবাদ উপযোগী একটি জাত (বারি জিরা-১) ২০২২ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। বারি জিরা-১ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারিত হলে জিরা আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনার পাশাপাশি কৃষকগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

আবহাওয়া ও জলবায়ু

জিরা প্রধানত গ্রীষ্ম ও উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ক্ষরাসহিষ্ণু ফসল। দিনের তাপমাত্রা বেশি ও রাতের তাপমাত্রা কম হলে জিরা উৎপাদনের জন্য সহায়ক হয়। অঙ্কুরোদগমের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা ১৫-২৫ক্ক সেলসিয়াস কিন্তু তাপমাত্রা ১০ক্ক সেলসিয়াস বা এর চেয়ে কম হলে অঙ্কুরোদগম ব্যাহত হয়। গাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য তাপমাত্রা ২৫-৩০ক্ক সেলসিয়াস প্রয়োজন হয়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬০-৬৫% হলে রোগের আক্রমণ কম হয় তবে আর্দ্রতা ৮০% বা এর বেশি হলে রোগের আক্রমণ বেড়ে যায়। জিরা চাষাবাদের জন্য ৩-৪ মাস কুয়াশামুক্ত বৃষ্টিপাতবিহীন শুষ্ক আবহাওয়ার প্রয়োজন। গবেষণার তথ্য মতে বাংলাদেশের বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চল এবং বিভিন্ন চরাঞ্চলসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বারি জিরা-১ চাষের সম্ভাবনা রয়েছে।

মসলা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত ১৬টি জিরার জার্মপ্লাজম গবেষণা মাঠে দীর্ঘদিন বিভিন্ন পরীক্ষা১-নিরীক্ষা ও বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বারি জিরা-১ জাতটি এদেশে চাষাবাদের জন্য ১ ২০২২ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বারি জিরা-১ শীতকালে চাষ করা যায়। গাছ লম্বা ও ঝোপালো, উচ্চতা ৪০-৫০ সেমি, গাছের পাতার রং গাঢ় সবুজ, প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৫-৬টি, ফুলের রং গোলাপি, আম্বেলের সংখ্যা ৭০-১০০টি, প্রতি আম্বেলে আম্বেললেট সংখ্যা ৫-৬টি প্রতিটি আম্বেললেটে বীজের সংখ্যা ৫-৭টি এবং ১০০০ বীজের ওজন ৪-৬ গ্রাম।এ জাতটির জীবনকাল ১০০-১১০ দিন। জাতটি বাজারে প্রাপ্ত জিরা অপেক্ষা অধিক সুগন্ধি। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫৫০-৬০০ কেজি।

মাটি

জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ হতে বেলে দো-আঁশ মাটি জিরা চাষের জন্য উপযোগী। মাটির pH ৬.৫-৭.৫ থাকা বাঞ্চনীয়। চিত্র-২ : বারি জিরা-১ এর ফুলসহ গাছ অধিক ক্ষারীয় বা অম্লীয় মাটিতে জিরা উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফসলটি জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারেনা বিধায় পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা জরুরি। রৌদ্রোজ্জ্বল ও উঁচু থেকে মাঝারি উঁচু জমি জিরা চাষের জন্য উপযোগী।

জমি তৈরি

জিরা চাষের জন্য নির্বাচিত জমির মাটি ঝুরঝুরে হতে হবে নতুবা অঙ্কুরোদগম ব্যাহত হতে পারে। জমির প্রকারভেদে চিত্র-৩: জিরার বীজ শোধন ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জমি থেকে আগাছা ও পূর্ববর্তী ফসলেরআবর্জনা সরিয়ে ফেলতে হবে। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য জমির মাটি ভালোভাবে সমান করতে হবে।

বপনের সময় ও পদ্ধতি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বারি জিরা-১ এর বিভিন্ন সময়ে জিরা চাষ করা হয়। নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহ হতে ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত বারি জিরা-১ এর বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করা যায়। ছিটিয়ে বপন করলে আন্তঃপরিচর্যার সমস্যা হওয়ায় রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় তবে সারিতে বপন করলে এ সমস্যা হয় না। বীজ বপনের জন্য ২ সারি বিশিষ্ট রি-ফারো বেড তৈরি করলে রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয় ও ফলন বৃদ্ধি পায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সেমি ও গাছ হতে গাছের দূরত্ব ৮-১০ সেমি রাখতে হয়।

বীজ হার

জিরার বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করা যায়। ছিটিয়ে বপন করলে হেক্টরপ্রতি ১০-১২ কেজি ও সারিতে বপন করলে ৮- ৯ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ শোধন

শোধন করে বপন করলে বীজবাহিত অনেক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ৩ গ্রাম প্রোভ্যাক্স-২০০ মিশিয়ে ১০-১২ মিনিট ছায়ায় রেখে দিতে হবে। এরপর ১.০-১.৫ সেমি মাটির গভীরে বীজ বপন করে ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

জিরার বীজ বপনের পর সেচ

অঙ্কুরোদগম জিরা চাষে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার উপর জিরার ফলন নির্ভরশীল। জিরার বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। চাষের জন্য নির্বাচিত জিরা বীজ প্রথমে রোদে ২-৪ ঘণ্টা শুকিয়ে নিতে হবে। অতঃপর ছায়ায় রেখে ঠান্ডা করতে হবে। ঠান্ডাকৃত বীজকে ৮-১৬ ঘণ্টা (Sastry and Anandaraj, 2013) পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর, পানি থেকে উঠিয়ে ভিজানো বীজ ৪৮ ঘণ্টা আর্দ্র চটের বস্তায় বায়ুরোধী অবস্থায় রাখতে হবে।

পরে বীজ বপনের পূর্বে বাঁশের কাঠি দ্বারা ১.০০-১.৫০ সেমি গভীর নালা করে উক্ত বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের পর সামান্য ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। বীজ বপনের ১ দিন পর হতে জমিতে হালকা সেচ দিতে হবে, যাতে সমস্ত জমিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকে। এ পদ্ধতি ব্যবহার করলে ৩-৪ দিনের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু হয়।

গাছ গজানোর পর কাটুই পোকার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে সন্ধ্যার পূর্বে প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মি.লি. ক্যারাটে বা ডার্সবান মিশিয়ে গাছের গোড়ার মাটিতে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে ।

সার প্রয়োগের পরিমাণ ও পদ্ধতি

জিরার জমিতে নিচে উল্লেখিত হারে ও সময়ে সার ব্যবহার করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

সারের নাম	পরিমাণ	প্রয়োগের সময়
গোবর	১২-১৫ টন/হেক্টর	শেষ চাষের সময়
ইউরিয়া	৬৫-৭০ কেজি	২ কিস্তি যথাক্রমে বপনের ৩০ ও ৬০ দিন পর
টিএসপি	৫৫-৬০ কেজি	শেষ চাষের সময়
এমওপি	৬০-৬৫ কেজি	শেষ চাষের সময়
বোরিক এসিড	১০ কেজি	শেষ চাষের সময়
জিংক সালফেট (মনো)	১২ কেজি	শেষ চাষের সময়

শেষ চাষের সময় সমস্ত জৈবসার, টিএসপি, এমওপি, বোরিক এসিড ও জিংক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। বপনের ৩০ ও ৬০ দিন পর ২ কিস্তিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের সময় জমিতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যাঃ

অন্যান্য প্রচলিত মসলা ফসলের তুলনায় জিরার সেচ ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে আলাদা। অন্য সকল ফসলে যে পরিমাণে এবং পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করা হয় তা জিরার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ জিরা পানি সাশ্রয়ী ফসল অর্থাৎ ফসল ফলানোর জন্য খুব অল্প পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়। জমিতে সেচ দেওয়ার দরকার হলে নালায় হালকাভাবে সেচ দিতে হবে। ফসলের বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সম্পূর্ণ জীবনকালে ৩-৪টি হালকা সেচের প্রয়োজন। তবে কখনোই সেচ দেওয়ার পর জমিতে অতিরিক্ত পানি আটকে রাখা যাবে না। বীজের দ্রুত অঙ্কুরোদগম, বৃদ্ধি, ফল ধারণ ও আশানুরূপ ফলনের জন্য যথাক্রমে বপনের ১ দিন পর, গাছের বয়স ২৫-৩০, ৫৫-৬০ এবং ৭৫-৮০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা বুঝে বেডের নালায় হালকা সেচ দিতে হবে। তবে ফুল আসা শুরুর পর জমিতে সেচের ব্যাপারে আরও সাবধান হতে হবে কারণ এসময় জমিতে আদ্রতা বেশি হলে গোড়া পচা বা ঢলে পড়া ও ব্লাইট রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় । এমনকি উক্ত রোগের কারণে সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আগাছা দমন

জিরা চাষের জন্য আগাছার আক্রমণ একটি বড় সমস্যা। সময়মতো আগাছা দমন করতে না পারলে ফলন কমে যেতে পারে। বীজ বপনের পর থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে সাধারণত ৩-৪ বার নিড়ানি দিতে হবে। জমিভেদে গাছের বয়স ২০-২৫, ৫০-৫৫, ৭০-৭৫ দিন হলে নিড়ানি দিতে হয়। আগাছা দমনের ক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে। কারণ এ সময় গাছের শিকড়ে আঘাত লাগলে ঢলে পড়া রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিবার সেচ প্রয়োগের পর জমির উপরিভাগের আস্তরণ ভেঙে দিতে হবে।

চারা পাতলাকরণ

জিরার রোগবালাই দমন ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য চারা পাতলাকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গাছের ঘনত্ব বেশি হলে রোগের আক্রমণ বৃদ্ধি পাবে ও কম হলে ফলন কমে যাবে। তাই সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ঠিক দূরত্ব বজায় রেখে ২-৩ বারে চারা পাতলা করে দিতে হবে। চারা পাতলা করার সময় পাশের চারার শিকড় আঘাতপ্রাপ্ত হলে চারা মারা যেতে পারে।

রগিং করা

ফসলের ফুল আসার সময় জমিতে মাঝে মাঝে জিরা সদৃশ জেরী নামক এক প্রকার আগাছা দেখতে পাওয়া যায়। যা তুলে ফেলে দিতে হবে। এছাড়া অন্য ফসল মিশ্রিত থাকলে সেগুলোও তুলে ফেলে দিতে হবে।

মাটি তোলা

রিজ ও ফারো পদ্ধতিতে জিরা চাষ করা হলেগাছের গোড়ায় ১ সেমি পুরুত্ব মাটি তুলে দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, গাছের গোড়ায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাটি তুলে দিলে গাছের মূল পচে যেতে পারে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে জিরা চাষের ক্ষেত্রে উইল্ট (ঢলে পড়া) ও অল্টারনারিয়া ব্লাইট রোগগুলোর আক্রমণ দেখা যায়।

উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ

চারা পর্যায় (২৫-৩০ দিন) হতে ৬৫ দিন বয়স পর্যন্ত জিরা এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। Fusarium oxysporum নামক ছত্রাকের দ্বারা এ রোগের সৃষ্টি হয়।

অল্টারনারিয়া ব্লাইট রোগ

অল্টারনারিয়া ব্লাইট রোগ ফুল আসার পূর্ব হতে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত যেকোনো সময় হতে পারে । Alternaria alternata (Wadud et al. 2021) নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়। সাধারণত ৩৫-৪৫ দিন বয়সে প্রথম আক্রমণ শুরু হয়ে ৫৫- ৭০ দিন বয়স হলে রোগের প্রভাব প্রকট আকার ধারণ করতে পারে। সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে না পারলে, আলুর লেট ব্লাইটের ন্যায় ফলন শতভাগ নষ্ট হতে পারে।

অল্টারনারিয়া ব্লাইট রোগের লক্ষণ

- প্রথমে পাতায় বা কঁচি ডগায় পচন ধরে।
- আক্রান্ত অংশে ভিজা ভিজা অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।
- পরে ডগা, শাখা-প্রশাখা ও কাণ্ডে এই রোগের বিস্তার ঘটে। রোগের প্রকটতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আক্রান্ত স্থান কালো হতে থাকে।
- সমস্ত ফসল আগুনে পোড়ার মতো ঝলসে কালো বর্ণ ধারণ করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

সুস্থ ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।
শস্যাবর্তন অনুসরণ করতে হবে।

- বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ৩ গ্রাম প্রোভ্যাভ-২০০ মিশিয়ে শোধন করতে হবে।
- প্রতি লিটার পানির সাথে ১০ গ্রাম ট্যাল্কভিত্তিক বায়ো কন্ট্রোল এজেন্ট (ব্যাসিলাস সাবটিলিস/সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্টস/ট্রাইকোডার্মা) মিশিয়ে সমস্ত গাছে ১২-১৫ দিন পরপর ৪-৫ বার স্প্রে করতে হবে।
- রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি এজোক্সিস্ট্রোবিন + ডাইফেনোকোনাজল ড্র গ্রুপের ছত্রাকনাশক (এমিষ্টার টপ ৩২৫ এসসি) মিশিয়ে বিকালবেলা ৭-৮ দিন পর পর সমস্ত গাছে ২ বার স্প্রে করতে হবে। পরবর্তীতে ৫৫-৬৫ দিন বয়সে পুনরায় রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি এজোক্সিস্ট্রোবিন + ডাইফেনোকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক (এমিষ্টার টপ ৩২৫ এসসি) মিশিয়ে বিকালে ৭-৮ দিন পরপর সমস্ত গাছে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

পোকা-মাকড় ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে জিরা চাষে পোকার আক্রমণ ততটা লক্ষণীয় নয়, তবে মাঝে মাঝে এফিড বা জাবপোকার আক্রমণ হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

এফিড বা জাবপোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানির সাথে ০.৫ মিলি গেইন/ইমিটাফ/টিডো/ইমপেল (ইমিডাক্লোর-পিড) মিশিয়ে ১০-১২ দিন দিন পরপর বিকালবেলা ১-২ বার স্প্রে করতে হবে।

পরাগায়নের সময় সাবধানতা অবলম্বন

জিরা একটি পর-পরাগায়িত (ক্রস-পলিনেটেড) মসলাজাতীয় ফসল। জিরার পরাগায়নপ্রধানত মৌমাছি দ্বারা সংঘটিত হয়। জিরার ফুল ৫০ দিন বয়স থেকে শুরু করে ৮৫ দিন বয়স পর্যন্তপ্রস্ফুটিত হয়। এই দীর্ঘ সময় ধরে মৌমাছি দ্বারা জিরার পরাগায়ন সংঘটিত হয়। পরাগায়নের এই সময় যদি পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য কীটনাশক স্প্রে করা হয়, তাহলে পরাগায়ন ব্যাহত হবে এমনকি ফুল হতে বীজ গঠন নাও হতে পারে। পরাগায়নের জন্য সকাল ১০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত কীটনাশক প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

বীজ বপনের

বীজগুলো হালকা ধূসর বাদামি বর্ণের ও বীজ হাতে নিয়ে চাপ দিলে দুইটি অংশ আলাদা হলে ফসল সংগ্রহ করতে হবে। মূলসহ গাছ সংগ্রহ বা মাটির খুব নিকট হতে কেটে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

মাড়াই ও ঝাড়াই

জমি থেকে ফসল সংগ্রহের পর পাতলা করে থ্রেসিং ফ্লোরে বিছিয়ে দিতে হবে। প্রখর রোদে ২-৩ দিন শুকিয়ে আলাদা করে আটি বেঁধে কাঠের ওপর আঘাত করলে সহজেই গাছ থেকে বীজ ছাড়ানো যায়। পরবর্তীতে বীজগুলো পরিষ্কার করে ৮-৯% আর্দ্রতা আসা পর্যন্ত রোদে শুকাতে হবে। এরপর বীজ বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

ফলন :

সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বারি জিরা ১ চাষাবাদ করলে হেক্টরপ্রতি ৫৫০ - ৬০০ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

তেল জাতীয় ফসল

বাংলাদেশে তেলবীজ ফসল উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা, গবেষণা অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

কৃষি বাংলাদেশের জনমানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার প্রধানতম উৎস। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো কৃষি। খাদ্যশস্য উৎপাদন, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি বাণিজ্যেও কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কৃষির উন্নয়ন মানে দেশের সার্বিক উন্নয়ন। এদেশে জনসংখ্যা ১.০১% হারে বৃদ্ধির ফলে প্রতি বছর ২০-২২ লক্ষ নতুন মুখ যুক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রতিবছর ০.৭৩ হারে কৃষিজমি কমে যাচ্ছে। সীমিত কৃষিজমির যথাযথ ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলা করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এমতাবস্থায়, সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী নতুন নতুন জাত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রয়োজন। দেশের ক্রমহ্রাসমান কৃষিজমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং খোরপোশ কৃষি থেকে কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে কৃষকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে বর্তমান সরকার এ খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি এবং সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে গত এক দশকে কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে তেলফসল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিষয়। মানবদেহে পুষ্টি নিরসনে উদ্ভিজ্জ ভোজ্যতে-লবিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে আসছে। খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে ভোজ্যতেলকে বলা হয় পুঞ্জীভূত শক্তির আধার। তেলজাতীয় খাদ্য শক্তির জোগান দেওয়ার পাশাপাশি দেহের কোষ-কলা গঠনেও সহায়তা করে এবং ভিটামিন এ, ডি, ই, কে-এর পরিপাকে সাহায্য করে। মানবদেহে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড তৈরি হয় না বিধায় ভোজ্যতেল গ্রহণের মাধ্যমে তা পূরণ করতে হয়। ভোজ্যতেলের বিভিন্ন প্রকার অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড যথা লিনোলেয়িক ও লিনো-লনিক এসিড দেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে এবং ত্বকের মসৃণতা রক্ষায় তেলের ভূমিকা রয়েছে। সেজন্য দেহকে সুস্থ ও রোগ প্রতিরোধী রাখতে নিয়মিত সঠিক পরিমাণে ভোজ্যতেল গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা, এফএও, গ্লোবাল ফোরাম ফর নিউট্রিশন, আমেরিকান হার্ট অ্যাসো-সয়েশনসহ বিভিন্ন সংস্থার মতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মানবদেহের দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৩০ শতাংশ ভোজ্য তেল থেকে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত তেলের প্রাপ্যতা কম থাকায় বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু গড় আহরিত ক্যালরির মাত্র ৯ শতাংশ ভোজ্যতেল থেকে আসে। আমদানিকৃত ভোজ্যতেলের কিছু অংশ শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত হয়। কাজেই ভোজ্যতেল এবং শিল্পকারখানায় ব্যবহারের জন্য তৈলবীজের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

দেশে ভোজ্যতেল উৎপাদনের জন্য প্রধানত সরিষা, তিল এবং সূর্যমুখী চাষ হয়ে থাকে। চাহিদার তুলনায় ভোজ্য তেলের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে বাংলাদেশে। অথচ প্রয়োজনের অনেকাংশ তৈলবীজ জাতীয় ফসল দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব। উন্নত জাত ও উৎপাদন কৌশলের অপর্যাপ্ত ব্যবহার এবং সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তেলজাতীয় ফসলের আবাদ। তাই ভোজ্যতেলের উৎপাদন ঘাটতি কমানো বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। এদেশে বর্তমানে ভোজ্যতেলের মোট প্রয়োজন প্রায় ১২.৮৫ লক্ষ মে.টন। সরিষা, তিল এবং সূর্যমুখী থেকে মোট ২.৩৬ লক্ষ মে.টন তেল উৎপাদিত হয়ে থাকে। দেশের মোট চাহিদার তুলনায় এ উৎপাদন নিতান্তই অপ্রতুল বিধায় ভোজ্যতেলের বাজার হয়ে পড়েছে আমদানি নির্ভর। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সয়াবিন, পাম তেল ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তেল আমদানি করা হয় ৪৬.২১ লক্ষ মে.টন (বিবিএস ২০১৮)। এর ফলে একদিকে যেমন বিদেশে প্রচুর অর্থ চলে যাচ্ছে, তেমনি আমদানি ও বিপণনে মধ্যসত্বভোগীদের ওপর নির্ভরতা পণ্যটির বাজারকে প্রায় অস্থিতিশীল করেছে।

বাংলাদেশে মোট আবাদি জমির পরিমাণ ৮.৫৯ মিলিয়ন হেক্টর যা মোট জমির ৫৮%। এই আবাদি জমির মাত্র ৩% জায়গায় তৈলবীজ ফসলসমূহের চাষ হয় (বিবিএস ২০২২)। আমাদের আবাদকৃত তৈলবীজ ফসলসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জায়গা দখল করে আছে সরিষা (৬৬.৪৪%), তারপর সয়াবিন (১১.৬২%), চীনাবাদাম (৬.২৮%), তিল (৭%), তিসি (১.২৯%) এবং সূর্যমুখী (০.৩২%) (বিবিএস ২০২২)। অত্যন্ত দ্রুততায় এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। অর্থনীতিতে অবদান রাখা প্রতিটি খাতেই এই অগ্রগতি লক্ষণীয়। সবচেয়ে বেশি সফলতা এসেছে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার পর, ১৯৭২-১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখন থেকেই কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রচলন ও ব্যবহার উৎসাহিত করা হয়। সহজ ও হাতের নাগালে আনা হয় কৃষি উপকরণের সরবরাহ। সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়। অনেকখানি নিশ্চিত করা হয় কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য। এতে ফল আসতে থাকে দ্রুতই, উৎপাদনে আগ্রহী হয়েছে কৃষকগণ আর বেড়েছে কৃষির সার্বিক উৎপাদন। ১৯৭২ সালের ১ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের বিপরীতে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি টনের ওপরে। গত ৪৯ বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে প্রতিবছর প্রায় ৩ শতাংশ হারে। এ সময়ে বৈশ্বিক গড় উৎপাদন বেড়েছে ২.৪ শতাংশ হারে। আর বাংলাদেশে তৈলবীজ ফসলের উৎপাদন বেড়েছে ৪ শতাংশ হারে। খাদ্য ঘাটতি, মঙ্গা আর ক্ষুধার দেশ এখন শস্য উৎপাদনে ঈর্ষণীয় উচ্চতায় পৌঁছেছে। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলেই হয়েছে এই বিপুল উন্নয়ন।

যুগের পর যুগ চলে আসা ঘাটতি ওআমদানি নির্ভরতা ভোজ্যতেল খাতের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক ও গবেষক মহলের নজরে আসে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের ওপর নতুন নতুন আধুনিক জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। অদ্যাবধি সেই গুরুদায়িত্বের অংশ হিসেবে বিএআরআই হতে দেশে চাষাবাদের জন্য ৮টি তেল জাতীয় ফসলের (সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, সয়াবিন, সূর্যমুখী, তিসি, কুসুম ফুল ও গর্জন তিল) মোট ৫২টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। তার মধ্যে সরিষার ২০টি, চীনাবাদামের ১২টি, তিলের ৬টি, সয়াবিনের ৭টি, সূর্যমুখীর ৩টি, তিসির ২টি, গর্জন তিলের ১টি ও কুসুম ফুলের ১টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

পিছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, ১৯৭২-৭৩ সালে ভোজ্যতেলের উৎপাদন ছিল মাত্র ৫৪.৬ হাজার মেট্রিক টন, যা তখনকার ৭.৫ কোটি মানুষের চাহিদার ৩০ শতাংশ পূরণ করত বাকি ৭০ ভাগই ঘাটতি থাকত। তখন তৈলবীজ ফসলসমূহের উচ্চ ফলনশীল জাত বা আধুনিক চাষাবাদ প্রযুক্তি ছিল না। এ সময় স্থানীয় ও স্বল্প উৎপাদনক্ষম জাতের চাষ হতো। তখন কৃষি সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধান ফসলসমূহ বিশেষ করে ধান, পাট, ইক্ষু ফসলকে ঘিরে গবেষণা পরিচালনা করত। ১৯৭১ সালে সরকার তেল ফসলের ওপর একটি প্রকল্প হাতে নিলেও তা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে শুরু করা যায়নি। পরবর্তীতে ১৯৭২-৭৩ সালে নতুন গঠিত সরকার ভোজ্যতেলের গুরুত্ব ও ঘাটতি সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ অনুধাবন করে সুইডেন সরকারের সহায়তায় (SIDA) উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে 'Accelerated Winter Oilseed Improvement and Development Programme' নামে একটি প্রকল্প চালু করে। এই কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্প চলাকালীন সময়ে দেশ ও বিদেশ থেকে সরিষা, তিল এবং সূর্যমুখীর বেশকিছু জার্মপ্লাজম (কৌলিসম্পদ) সংগ্রহ করা হয়। টরি-৭ জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে যা ১৯৭৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন করা হয়। এ জাতটি উদ্ভাবিত সকল জাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে পরিপক্ব হয়, ৭০-৮০ দিনের মধ্যে শস্য সংগ্রহ করা যায়। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সোনালি সরিষা (এস এস-৭৫) ও কল্যানীয়া (টি এস-৭২) নামের সরিষার দুটি জাত নিবন্ধিত হয়। এই জাত দুটি প্রচলিত টরি-৭ এর তুলনায় অধিক ফলন দিতে সক্ষম ছিল। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তৈলবীজ গবেষণা ও উন্নয়নে কোনো বিদেশি অর্থায়ন না থাকায় সরকারি সহায়তায় সীমিত পরিসরে তা চলতে থাকে। আর সম্প্রসারণ কর্মসূচি আরও সীমিত হয়ে পড়ে। এই দশকে বিএআরআই থেকে সরিষার একটি জাত (দৌলত), তিনটি চীনাবাদামের জাত (ডিজি-২, ডিএম-১ ও ঝিঙ্গাবাদাম), একটি সূর্যমুখীর জাত (কিরনী), একটি গর্জন তিলের জাত (শোভা) ও একটি তিসির জাত (নীলা) অবমুক্ত করা হয়। এ সময় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাউ) ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এ ও তৈলবীজের ওপর গবেষণা শুরু হয়।

১৯৯০ সালের পর সরকার ফসলের বিচিত্রতার ওপর গবেষণা জোরদার করে এবং বিশ্বব্যাংক, ইউএস-এইড, এডিবি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করলে 'Crop Diversification Programme in Bangladesh' নামে একটি প্রকল্প চালু হয়। এরপর বিভিন্ন সংস্থার যৌথ গবেষণায় কিছু জাত উদ্ভাবন করা হয়। ১৯৯৪ সালে বারি সরিষা-৬, বারি সরিষা-৭ ও বারি সরিষা-৮ অবমুক্ত করা হয়। ২০০০ সালে বারি সরিষা-৯ ও বারি সরিষা-১০ অনুমোদন লাভ করে। এছাড়া ২০০৪ সালে বারি সরিষা-১৩ ও ২০০৬ সালে বারি সরিষা-১৪ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। ২০০৯ সালে বারি সরিষা-১৬, ২০১৩ সালে বারি সরিষা-১৭ এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালে বারি সরিষা-১৮ অবমুক্ত করা হয়। সরিষা সমগ্র বাংলাদেশে চাষ করা যায় তবে মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, জামালপুর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায় ভালো জন্মে। ২০০১ সালে বারি তিল-৩ ও ২০০৯ সালে বারি তিল-৪ অবমুক্ত হয়। তিলযশোর, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া এবং রাজশাহী অঞ্চলে ভালো জন্মে। চীনাবাদামের মধ্যে ২০০৬ সালে বারি চীনাবাদাম-৮ এবং ২০১৬ সালে বারি চীনাবাদাম-১০ অনুমোদন লাভ করে। চীনাবাদাম পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, নোয়াখালী, ফরিদপুর, দিনাজপুর, ঢাকা, পাবনা এবং নরসিংদীর চরাঞ্চলে ভালো জন্মে। ২০০৪ সালে বারি সূর্যমুখী-২ এবং ২০১৮ সালে বারি সূর্যমুখী-৩ (খাটো জাত) অবমুক্ত হয়। সূর্যমুখী আবাদ করা হয় খুলনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রংপুর, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট অঞ্চলে। তবে সবচেয়ে ভালো হয় বরিশাল ও পটুয়াখালী এলাকায়।

অন্যদিকে, ২০০২ সালে বারি সয়াবিন-৫, ২০০৯ সালে বারি সয়াবিন-৬ এবং ২০২০ সালে বারি সয়াবিন-৭ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চাঁদপুর, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ফেনী অঞ্চলে অধিক পরিমাণে সয়াবিন চাষাবাদ করা হয়।

চাষকৃত জনপ্রিয় জাতসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সরিষাঃ

সরিষার বেশকিছু জাত ভালো ফলন, বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় চাষাবাদের কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বারি সরিষা-১৪ এদের মধ্যে অন্যতম। গাছের উচ্চতা ৭৫-৮৫ সেমি। বীজের রং হলুদ বর্ণের। স্থিতিকাল ৭৫-৮০ দিন। ফলন হেক্টরে ১.৪০-১.৬০ টন। এ জাতটি টরি-৭ এর চেয়ে ২৫-৩০% বেশি ফলন দেয়। আমন ধান কাটার পর স্বল্পমেয়াদি জাত হিসেবে চাষ করে বোরো ধান রোপণ করা সম্ভব। বারি সরিষা-১৬ ব্রাসিকা জুনসিয়া প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। গাছের উচ্চতা ১৭৫-১৯৫ সেমি। বীজের রং পিঙ্গল বর্ণের। স্থিতিকাল ১১০-১২০ দিন। ফলন ২.০০-২.৫০ টন/হেক্টর। জ্বালানি ৩.০০-৩.৫০ টন/হেক্টর। আমন ধান কাটার পর পাট বা রোপা আউশ করে এরুপ জমিতে এই জাতটি নাবি জাত হিসেবে চাষ কর যায়। এই জাতটি খরা এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু। এটি অলটারনেরিয়া রোগ ও অরোবাংকি পরজীবী সহনশীল। বারি সরিষা-১৭ জাতটি ক্রুসিফেরী পরিবারের ব্রাসিকা রাপা প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। বারি সরিষা-১৪ ও বারি সরিষা-১৫ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে লাইনটি উদ্ভাবন করা হয়। বারি সরিষা-১৭ জাতটি স্বল্পমেয়াদি। স্থিতিকাল ৮০-৮৫ দিন। গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেমি। গাছ সহজে ঢলে পড়ে না। জাতটির ফুলের ও বীজের রং হলুদ। বীজের রং হলুদ হওয়ায় প্রচলিত বাদামি রঙের বীজের তুলনায় ৩-৪% তেল বেশি থাকে। প্রতি হেক্টরে ফলন ১.৭০-১.৮০ টন। এ জাতটি বারি সরিষা-১৪ অপেক্ষা ৫-১০% বেশি ফলন দিয়ে থাকে। জাতটি স্বল্পমেয়াদি হওয়ায় রোপা আমন-সরিষা-বোরো ধান শস্যবিন্যাসের জন্য উপযুক্ত অর্থাৎ আমন ধান কর্তনের পর উক্ত জাতটি চাষ করে বোরো ধান চাষ করা সম্ভব। বারি সরিষা-১৮ ক্রুসিফেরী পরিবারের ব্রাসিকা ন্যাপাস প্রজাতির অন্তর্গত একটি সরিষার জাত। এ জাতটি বাংলাদেশে উদ্ভাবিত প্রথম 'ক্যানোলা' বৈশিষ্ট্যের জাত। অস্ট্রেলিয়ার ইঘ-১৪০৪ লাইন অধিকতর নির্বাচনের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বপন হতে কর্তন পর্যন্ত সময়কাল ৯৫-১০০ দিন। সমগ্র বাংলাদেশে চাষ উপযোগী এ জাতের তেলে ইরুসিক এসিডের পরিমাণ ১.০৬% যেখানে বর্তমানে বাংলাদেশে চাষকৃত অন্যান্য উন্নত সরিষার জাতে ইরুসিক এসিডের পরিমাণ ৩৫%-৪০% এবং গ্লুকোসিনেলেটের পরিমান ১৪ মাইক্রোমোল (প্রচলিত জাতে ২৫-৩০ মাইক্রোমোল)।

পরিমাণমতো সার ও সেচ প্রয়োগে এ জাত ২.০০-২.৫০ টন/হেক্টর পর্যন্ত ফলন দেয়। এ জাতে তেলের পরিমাণ ৪০%-৪২%। পুষ্টির গুণাগুণ বিবেচনায় বাণিজ্যিকভাবে সরিষা চাষের ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত এ জাত বাংলাদেশে মাইলফলক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

তিল:

তিলের বিভিন্ন জাতের মধ্যে বারি তিল-২ এর ফলন হেক্টর প্রতি ১.২০-১.৩০ টন। বীজের ত্বক কালচে বর্ণের। এ জাতটি আগাম বপনের (মাঘ/ফাল্গুন) জন্য উপযোগী। এছাড়াও বারি তিল-৩ যা ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং বীজের ত্বকের রং গাড় লালচে। এ জাতের ফলন হেক্টরপ্রতি ১.২০-১.৪০ টন। বারি তিল-৪ জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র খরিফ (মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য-এপ্রিল) মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী। অধিকাংশ শুঁটিই ৮ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং প্রতি শুঁটিতে বারি তিল-২ ও বারি তিল-৩ এর তুলনায় ২০-৪০% বেশি বীজ থাকে। বীজের ত্বক গাড় লালচে বর্ণের। জাতটি পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রমণসহিষ্ণু। এর হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৪০-১.৫০ টন যা বারি তিল-২ ও বারি তিল-৩ এর তুলনায় ৮-১০% বেশি।

চীনাবাদাম:

তৈলবীজ ফসলের একটি অর্থকরী ফসল। গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন জাতের মধ্যে মাইজচর বাদাম (ঢাকা-১) ১৯৭৬ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে। জাতটি আগাম পরিপক্কতার জন্য কৃষকদের মাঝে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় কিন্তু জাতটি অতি মাত্রায় রোগের প্রতি সংবেদনশীল। বাসন্তী বাদাম (ডিজি-২) জাতটি হেক্টরে ২.০০-২.২২ টন ফলন দেয়। ফসল পাকার পর ৩০-৪৫ দিন পর্যন্ত এ জাতের বীজের সুপ্ততা থাকে। তাই ফসল কাটার পূর্বে আগাম বন্যা বা বৃষ্টির পানি পেলেও বীজ জমিতে গজায় না। এ জাত গোড়া ও কাণ্ড পচা রোগ এবং পাতার দাগ রোগ সহনশীল ওপ্রতিরোধী। বাংলাদেশের নদীর চরাঞ্চল ও মাঝারি উঁচু জমিতে এর ফলন ভালো হয়। ঝিঙা বাদাম (এসিসি-১২) জাতটি বেশ রোগ সহনশীল। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-ডিসেম্বর) বীজ বপন করলে ফলন হেক্টরপ্রতি ২.৪০-২.৬০ টন পাওয়া যায়। ত্রিদানা বাদাম (ডিএম-১) জাতের গাছের উচ্চতা বেশ কম এবং ৩-৪ দানা বিশিষ্ট। তাই খাটো হওয়ায় ভুট্টা ও ইক্ষুর সাথি ফসল হিসেবে চাষাবাদের জন্য সুবিধাজনক। বারি চিনাবাদাম-৮ জাতটি ২০০৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ জাতের দানার আকার বেশ বড় এবং বাদামগুলি থোকায় থোকায় জন্মে এবং সেলিং হার শতকরা ৬৫-৭০ ভাগ যার জন্য কৃষকের মাঝে দিন দিন জনপ্রিয়তা বাড়ছে। বারি চিনাবাদাম-৯ তুলনামূলক আগাম পরিপক্ব হয় এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ২.৫০-২.৮০ টন। বারি চিনাবাদাম-১০ একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। এটি দেশের চরাঞ্চলে চাষাবাদের জন্য উপযোগী। জাতটি সল্পমাত্রায় খরা ও রোগ সহনশীল।

সয়াবিন:

সয়াবিনের জাতগুলোর মধ্যে বারি সয়াবিন-৫, বারি সয়াবিন-৬ ও বারি সয়াবিন-৭ জাত ফলন বেশি দেওয়ার জন্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বারি সয়াবিন-৬ এ মোজাইক ভাইরাসের আক্রমণ কম হয়। বারি সয়াবিন-৭ জাতটি উচ্চ ফলনশীল, খাটো, ও খাড়া প্রকৃতির, খরাসহিষ্ণু ও পাতা শোষক পোকা এবং হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। সয়াবিনে শতকরা ৪২-৪৫ ভাগ আমিষ এবং ২০-২২ ভাগ ভোজ্যতেল থাকে।

সূর্যমুখীর জাতের মধ্যে বারি সূর্যমুখী-২ ও বারি সূর্যমুখী-৩ কৃষকের মাঠে আবাদ হচ্ছে। এ জাত দুটিতে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪২% এবং ফলন হেক্টরপ্রতি ১.৫০ থেকে ১.৮০ টন। বারি সূর্যমুখী-৩ খাটো হওয়ায় ঢলে পড়েনা বিধায় কৃষকদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে। এ জাতটিতে পাতা ঝলসানো ও ঢলে পড়া বা মূল পচা রোগের প্রার্দু-ভাব খুব একটা দেখা যায় না।

তেলবীজ ফসলের উদ্ভাবিত অন্যান্য প্রযুক্তিসমূহ

ক) শস্য ব্যবস্থাপনা

বেশিরভাগ তেলবীজ ফসল সাধারণতঃ
রবি মৌসুমে চাষ হয়ে থাকে। রবি মৌসুমে অন্যান্য ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এবং তৈলবীজ ফসলের মোট উৎপাদন বাড়াতে হলে অবশ্যই উন্নত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। এই আঙ্গিকে তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের শস্য ব্যবস্থাপনার শাখা থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০টির মতো প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। কৃষিতাত্ত্বিকভাবে উপযোগী এবং লাভজনক প্রযুক্তিগুলোর বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো–

আন্তঃফসল হিসেবে চীনাবাদামের সাথে রসুন, পেঁয়াজ, গাজর, লালশাকের চাষঃ
দুই সারি চীনাবাদামের মাঝে দুই সারি রসুন, পিঁয়াজ, গাজর, লালশাক চাষ কৃষিতাত্ত্বিকভাবে উপযোগী। ৪০ সেমি.দূরত্বে দুই সারি চীনাবাদামের মাঝে ১৫ সে মি. দূরত্বে দুই সারি রসুন, পেঁয়াজ, গাজর ও লালশাকের চাষ করলে আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করলে একক ফসল চীনাবাদামের চেয়ে মোট উৎপাদন বেশি পাওয়া যায় এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব।

আন্তঃফসল হিসেবে সূর্যমুখীর সাথে সয়াবিন ও চীনাবাদামের চাষঃ
একক ফসল সূর্যমুখীর চাষের পরিবর্তে আন্তঃফসল হিসেবে সূর্যমুখীর সাথে সয়াবিনের ও চীনাবাদামের চাষ করা সম্ভব। সূর্যমুখীর সারি পুনঃবিন্যাস করে দুই জোড়া সারি সূর্যমুখীর মাঝে দুই সারি সয়াবিন ও চীনাবাদাম চাষ করলে একক ফসল সূর্যমুখীর চেয়ে অধিক ফলন ওঅর্থনৈতিকভাবে লাভ করা যায়।

আন্তঃফসল হিসেবে ভুট্টার সাথে চীনাবাদাম ও সয়াবিনের চাষঃ
দুই জোড়া সারি ভুট্টার মাঝে তিন সারি চীনাবাদাম অথবা তিন সারি সয়াবিনের চাষ কৃষিতাত্ত্বিকভাবে উপযোগী। এর ফলে একক ফসল ভুট্টার থেকে অধিক ফলন ওঅর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।
আন্তঃফসল হিসেবে তিলের সাথে চীনাবাদামের চাষঃ দুই জোড়া সারি তিলের মাঝে তিন সারি চীনাবাদাম চাষ করলে একক ফসল তিল থেকে অধিক ফলন ও অধিক লাভ পাওয়া যায়।

আন্তঃফসল হিসেবে চীনাবাদামের সাথে মসুর ও তিসির চাষঃ
দুই সারি চীনাবাদামের মাঝে এক সারি মসুর ও তিসিচাষ কৃষিতাত্ত্বিকভাবে উপযোগী। আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করলে একক ফসল চীনাবাদামের চেয়ে মোট উৎপাদন বেশি
পাওয়া যায় এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব।

বছরে এক জমিতে তিন ফসলভিত্তিক ফসল ধারাঃ
রোপা আমন-সরিষা-তিল ফসল ধারাটি কৃষিতাত্ত্বিকভাবে চাষ করা সম্ভব। এ ধারাটিতে কৃষকের ফসল ধারা থেকে বেশি লাভ পাওয়া যায়।

বছরের এক জমিতে চার ফসলভিত্তিক ফসল ধারাঃ
(ক) রোপা আমন-সরিষা-মুগ-রোপা আউশ, (খ) আমন ধান আলু-বোরো ধান-আউশ ধান ও (গ) রোপা আমন-সরিষা-বোরো ধান-রোপা আউশ ফসল ধারাগুলো কৃষিতাত্ত্বিকভাবে চাষ করা সম্ভব, এতে করে শস্য নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ফলে আমাদের দেশে কৃষকের আয় বৃদ্ধি হবে এবং তা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে। এই ধারাগুলো থেকে কৃষকের ফসল ধারা থেকে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়। এছাড়াও মৌচাষের মাধ্যমে পরাগায়ন ত্বরান্বিত করে সরিষার ফলন ১০-১৫% বৃদ্ধি করা সম্ভব। মৌ চাষ পরাগায়নের মাধ্যমে কেবল তেল ফসলের উৎপাদনই বাড়ে না পাশাপাশি মধুও উৎপাদিত হয় যা থেকে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব। বাংলাদেশে অত্যন্ত সীমিত আকারে মৌচাষ চলমান। এটাকে সমগ্র তেল ফসলের জমিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে আলাদা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

খ) বালাই দমন ব্যাবস্থাপনা

রোগ দমন ব্যাবস্থাপনা:

কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরিষার কাণ্ড পচা ও পাতা ঝলসানো রোগ দমন ব্যবস্থাপনা:
সরিষার বীজ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বপন করে কাণ্ড পঁচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ এড়ানো যায়।

কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চীনাবাদামের গোড়া পচা রোগ দমন:
বাদামের বীজ ২১ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বরের মধ্যে বপন করে বাদামে গোড়া পচা রোগ এড়ানো যায়।

ছত্রাকনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে সরিষার পাতা ঝলসানো রোগ দমন ব্যবস্থাপনা:
রোভরাল/ইন্ডোফিল ২.০ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ৩ বার স্প্রে করে সরিষার পাতা ঝলসানো রোগ দমন করা যায়।

ছত্রাকনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে সরিষার কাণ্ড পচা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা:
রোভরাল ২.০ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩ বার (বৃদ্ধি পর্যায়ে, ফুল আসা ও সিলিকুয়া ধরার পর্যায়) প্রয়োগ করলে সরিষার কাণ্ড পচা রোগ (৭৫%) দমন হয়।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চীনাবাদামের গোড়া পচা রোগ দমন:
বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পূর্বে মুরগির বিষ্ঠা ৫ টন/হেক্টর বা সরিষার খৈল ১টন/হেক্টর প্রয়োগ এবং প্রভেন্ড-২০০ ছত্রাক-নাশক (২.৫ গ্রাম ছত্রাকনাশক (কেজি বীজ) দ্বারা বীজ শোধন করে বপন করে বাদামের গোড়া পচা রোগ দমন করা যায়।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরিষার পাতা ঝলসানো রোগ দমন ব্যবস্থাপনা:
বপনের পূর্বে প্রোভেক্স/ভিটাভেক্স-২০০দ্বারা শতকরা ০.২৫ ভাগ হারে (২.৫ গ্রাম ছত্রাকনাশক/কেজি বীজ) দিয়ে শোধন এবং বপনে ৫০ দিন পর রোভরাল ২.০ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে এক বার সমস্ত গাছে স্প্রে করে সরিষার পাতা ঝলসানো রোগ সফলভবে দমন করা যায়।

সূর্যমুখীর পাতা ঝলসানো রোগ দমন:
রোভরাল/এন্ডোফিল ২.০ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩ বার প্রয়োগ করলে সূর্যমুখী পাতা ঝলসানো রোগ দমন করা যায়।

পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা:

বাদামের পিঁপড়া এবং উইপোকা দমন ব্যবস্থাপনা:
বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজে ৫ মি. লি. কেরোসিন তেল বা ২ গ্রাম সেভিন পাউডার মিশিয়ে বীজ বপন করে এ পোকা দমন করা যায়।

সরিষার জাবপোকা দমন ব্যবস্থাপনা (রাসায়নিক কীটনাশক ছাড়া):

৫০ গ্রাম নিমবীজ নির্যাস প্রতি লিটার পানিতেমিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার (বপনের ৪৫-৬০ দিন পর) স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

সরিষার জাবপোকা দমন ব্যবস্থাপনা (রাসায়নিক কীটনাশক দ্বারা):

মেলাটাফ ৫৭ ইসি ২ মিলি লিটার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বা রিপকর্ড ১০ ইসি ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে পড ধরা পর্যায়ে ১ বার স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

তিলের হকমথ ও বিছাপোকা দমন ব্যবস্থাপনা:

সকালে এবং বিকালে হাত বাছাই ও পার্সিং করে (বিঘাপ্রতি ১০-১২টি কঞ্চি) এই পোকা দমন করা যায়।

তিলের হকমথ ও বিছাপোকা দমন (রাসায়নিক) ব্যবস্থাপনা:

ডার্সবান ২০ ইসি বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি ২ মিলি লিটার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজ বপনের ৪৫-৬০ দিনের মাথায় ২ বার স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

সয়াবীনের পাতা মোড়ানো পোকা এবং বিছাপোকা দমন ব্যবস্থাপনা:

ডায়াজিনন ৬০ ইসি ২ মিলি লিটার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজ বপনের ৪৫-৬০ দিনের মাথায় ২ বার স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

বাদামের জ্যাসিড ও থ্রিপস পোকা দমন ব্যবস্থাপনা:

অ্যাডমায়ার ২০০ এসএল ০.২৫ মিলি লিটার প্রতি লিটার পানিতে বীজ বপনের ৬৫, ৭৫, ৮৫ দিন পর (১০ দিন অন্তর অন্তর) ৩ বার স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

সয়াবিনের সমন্বিত পোকা দমন ব্যবস্থাপনা:

হ্যান্ড পিকিং, সেক্স ফেরোমেন ফাঁদ ও পরজীবী পোকা (ব্রাকন, ট্রাইক্রোগ্রামা) দ্বারা সহজেই সয়াবিনের পেস্ট কমপ্লেক্স (পাতা মোড়ানো পোকা, বিছাপোকা, ও সাধারণ কাটুই পোকা) দমন করা যায়।

তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড:

তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র হতে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রযুক্তি প্রদর্শনী, মাঠদিবস/ কৃষক সমাবেশ, কৃষক প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক সহকারীদের প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সামাজিক ও সংবাদ মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তিসমূহ প্রচার করা হয়। এছাড়াও গবেষণা, প্রদর্শনী ও অন্যান্য কর্মসূচির জন্য বীজ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিগত ২০২১-২২ সালে ৩০০ জন কর্মকর্তা ও ২৭৫০ জন কৃষকের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৫৩টি প্রদর্শনী ও ৪৩০৫ জন কৃষকের সমন্বয়ে কৃষক সমাবেশের আয়োজন করে। ২০২১-২০২২ সালে ২১ মেট্রিক টনের বেশি বীজ বিএডিসি, ডিএইসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়, যার মধ্যে সরিষা ১২.০ টন, চীনাবাদাম ৭৯৫ কেজি, সয়াবিন ২১৫৭ কেজি, সূর্যমুখী ৭৭৩ কেজি ও তিল ১.২৭ টন। বর্তমানে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে চরাঞ্চল, অনাবাদি পতিত, পাহাড় ও নতুন নতুন এলাকায় তৈলবীজ ফসলসমূহের চাষাবাদ সম্প্রসারণ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

তেলবীজ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা:

বাংলাদেশের প্রায় ২২.০০ লক্ষ হেক্টর মৌসুমি পতিত জমি রয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে শস্যবিন্যাস বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রায় ২০.০০ লক্ষ হেক্টর জমি আছে যেখানে রোপা আমন পতিত-বোরো শস্যবিন্যাস রয়েছে সেগুলেকে রোপা আমন-সরিষা-বোরো ধান শস্যবিন্যাসে স্থানান্তরিত করা যায় তাহলে সরিষা উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে মোট তেল ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ৮.৬১ লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন হয়েছিল ১২.৬২ লক্ষ মে.টন বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বেশ কয়েকটি উন্নতমানের স্বল্প জীবনকালের সরিষার জাত যেমন-বারি সরিষা-১৪, ১৫, ১৭ এবং ২০ ইত্যাদি অবমুক্ত করা হয়েছে যা অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এই জাতগুলো আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। তাছাড়া অন্যান্য তেল ফসল যেমন: বারি তিল-৩, ৪, ৫ এবং ৬; এবং বারি চীনাবাদাম-৮, ৯, ১০, ১১ এবং ১২; বারি সয়াবিন-৫, ৬ এবং ৭ জাতগুলো প্রচলিত জাতের তুলনায় অনেক বেশি ফলন দেয়। বাংলাদেশে তেলজাতীয় ফসল হিসেবে সূর্যমুখী একটি সম্ভাবনাময় ফসল। এটি বাংলাদেশে সর্বত্র চাষাবাদ করা সম্ভব। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সূর্যমুখীর চাষ দিনদিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। উচ্চফলন-শীল খাটো জাত ব্যবহার করে লাভজনকভাবে এর উৎপাদন করা সম্ভব। পাশাপাশি চাহিদার ঘাটতি মোকাবিলায় বড় ধরনের বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। কৃষক পর্যায়ে যেমন উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সহজতর করা দরকার, তেমনি উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাও জরুরি। উন্নত জাত, মানসম্পন্ন বীজ, উপযুক্ত উৎপাদন কৌশল, পতিত জমি তেল ফসল চাষের আওতায় আনা, যান্ত্রিক চাষাবাদ সম্পৃক্ত করে তেল ফসল চাষাবাদ, উন্নত বাজার ব্যবস্থাপনা, মৌচাষ, দলভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষিত জনবল, অবকাঠামোগত সুবিধা, তেল নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য কৌশল প্রয়োগ করে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

উপসংহারঃ

কৃষিপণ্যে আমদানি নির্ভরতা খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি। ক্রান্তিকালে কোনো দেশই নিজেদের চাহিদা না মিটিয়ে অন্য দেশকে খাদ্যপণ্য দিতে ইচ্ছুক হবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'এক ইঞ্চি জমিও ফেলে না রাখার তাগিদ' এই বোধ থেকেই উৎসরিত। তেলফসলে বাংলাদেশের একশো ভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন আপাতঃদুরূহ কিংবা সময়সাপেক্ষ হলেও অসম্ভব নয়। প্রয়োজন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা, সম্ভবপর অধিক পরিমাণ জমি তেলফসলের আওতায় আনা এবং লাগসই প্রযুক্তি ও সেগুলোর ব্যবহার ও সম্প্রসারণ।

স্বল্পমেয়াদি ও ক্যানোলা জাতীয় সরিষার জাত পরিচিতি ও উৎপাদন কলাকৌশল

বাংলাদেশে তৈলবীজ ফসলের মধ্যে সরিষা প্রধান। প্রতিবছর প্রায় ৮.১৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে সরিষার চাষ হয় যা থেকে প্রায় ১১.৬ লক্ষ মেট্রিক টন সরিষা উৎপাদিত হয় (ডিএই, ২০২৩)। বাংলাদেশে সরিষার হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ১৪৩১ কেজি (ডিএই, ২০২৩)। সরিষার বীজে শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ তৈল এবং খৈলে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ আমিষ থাকে। ঘানির সাহায্যে ৩৩-৩৬ ভাগ এবং এক্সপেলারের মাধ্যমে ৩৬-৩৯ ভাগ তেল নিষ্কাশন করা যায়।

রবি মৌসুমে এ দেশে সরিষা চাষ হয়ে থাকে। রবি মৌসুমে সরিষা ছাড়াও অন্যান্য ফসল যেমন-গম, আলু, ভুট্টা, ডালজাতীয় ফসল, শাকসবজি ইত্যাদির চাষ হয়ে থাকে। এছাড়াও যেসব এলাকায় সেচের সুবিধা রয়েছে, সেসব এলাকার কৃষক ধান চাষে অধিক আগ্রহী। কাজেই সরিষার আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা খুবই সীমিত। তবে আগাম জাতের আমন ধান কর্তনের পর স্বল্পমেয়াদি সরিষা জাতের আবাদ করার পর বোরো ধান চাষের কোনো অসুবিধা হয় না।

এক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি উচ্চফলনশীল সরিষার জাতের প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বারি সরিষা-২০ নামে এ জাতটি উদ্ভাবন করেছে। আগাম জাতের আমন ধান কর্তনের পর এ জাতটি আবাদ করে বোরো ধানের আবাদ করা যায়। জাতটির বীজের রং হলুদ বিধায় বাদামি রঙের বীজের তুলনায় শতকরা ৩-৪ ভাগ তেল বেশি নিষ্কাশন করা যায়। বারি সরিষা-২০ জাতের গাছ পরিপক্ব হওয়ার পরও সোজা থাকে, হেলে পড়ে না। জাতটি নিজের ফুল দ্বারা নিজেই নিষিক্ত হয় বিধায় ঘন কুয়াশা কিংবা শৈত্যপ্রবাহের ফলে ফলনের তেমন একটি তারতম্য হয় না, যেখানে বাদামি বীজ বিশিষ্ট জাতগুলোর ফলন ব্যাপক হারে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর। এ জাতটি চাষ করে বারি সরিষা-১৪ জাতের অপেক্ষা ১০-১৫% বেশি ফলন পাওয়া যায়।

বারি সরিষা-২০

জাতের বৈশিষ্ট্য

জীবনকাল	:	৮০-৮৫ দিন (স্বল্পমেয়াদি)
শস্যবিন্যাস	:	আমন ধান কাটার পর স্বল্পমেয়াদি জাত হিসেবে চাষ করে বোরো ধান রোপণ করাসম্ভব।
উচ্চতা	:	৮০-১১০ সেমি.
পাতা	:	হালকা সবুজ রঙের এবং মসৃণ। কচি পাতা সম্পূর্ণ কাণ্ডকে ঘিরে রাখে।
শাখা	:	প্রাথমিক শাখার সংখ্যা সাধারণত: ৬-১০টি। সেকেন্ডারি শাখা হয় না বললেই চলে।
ফুল	:	প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়ির ওপরে থাকে। ফুলের রং হলুদ।
শুঁটি	:	প্রতি গাছে শুঁটির সংখ্যা ৫০-৫৫টি। প্রত্যেক শুটিতে বীজের সংখ্যা ২৮-৩৪টি।
বীজ	:	বীজের রং হলুদ বর্ণের। বীজের রং হলুদ বিধায় বাদামি রঙের বীজের তুলনায় শতকরা ৩-৪ ভাগ তেল নিষ্কাশন করা যায়। ১০০০ বীজের ওজন ৩.৫-৩.৮ গ্রাম।
বপনের উপযুক্ত সময়	:	অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি।
বীজের ফলন	:	প্রতি হেক্টরে ১৭০০-২০০০ কেজি।

বারি সরিষা-১৮ (ক্যানোলা জাত)

তেলের গুণগত মান

ইরুসিক এসিড	:	১.০৬% (সাধারণ সরিষায়: ৪০-৪৫%)
লিনোলিক এসিড (ওমেগা-৬)	:	২৪% (সাধারণ সরিষায়: ১৪-১৫%)
লিনোলেনিক এসিড (ওমেগা-৩)	:	৯% (সাধারণ সরিষায়: ৭-৮%)
ওলিক এসিড (ওমেগা-৯)	:	৫৮% (সাধারণ সরিষায়: ১৭-২০%)
গ্লোকোসিনোলেট (মাইক্রোমোল/গ্রাম)	:	১৪ মাইক্রোমোল/গ্রাম (সাধারণ সরিষায়: ১৯-২৪%)

জাতের বৈশিষ্ট্য

জীবনকাল	:	৯৫-১০০ দিন।
শস্যবিন্যাস	:	আমন ধান-সরিষা-পাট/ডালজাতীয় ফসল/অন্যান্য ফসল শস্যবিন্যাসে চাষের উপযোগী।
উচ্চতা	:	৯০-১২৫ সেমি যা মধ্যম খাটো।
পাতা	:	গাঢ় সবুজ রঙের, মসৃণ ও লোমহীন। পাতা বোঁটাবিহীন এবং পুষ্পপত্রের গোড়ার অংশ কাণ্ডকে অর্ধেক ঘিরে রাখে।
ফুল	:	মঞ্জুরিদণ্ডে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়ির নিচে অবস্থান করে। ফুলের রং হলুদ। গাছে দীর্ঘ দিন যাবৎ ধরতে থাকে।
শুঁটি	:	প্রতি গাছে শুঁটির সংখ্যা ৮০-১৩০টি। এর শুটি বেশ লম্বা ও দু'কক্ষ বিশিষ্ট। প্রত্যেক শুঁটিতে বীজের সংখ্যা ২৮-৩০টি।
বীজ	:	বীজের রং পিঙ্গল কালো। ১০০০ বীজের ওজন ৩.৫-৪.০ গ্রাম।
বীজে তেলের পরিমাণ	:	৪০-৪২%।
বপনের উপযুক্ত সময়	:	অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি।
বীজের ফলন	:	প্রতি হেক্টরে ২০০০-২৫০০ কেজি। এ জাতটি বারি সরিষা-১৪ এর চেয়ে ৩০-৬০% ভাগ বেশি ফলন দেয়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

আবহাওয়া

সরিষা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে এবং ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে ভালোভাবে জন্মায়। তবে, গাছের বৃদ্ধির জন্য ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উত্তম।

জমি ও মাটি নির্বাচন

দো-আঁশ মাটি বারি সরিষা-১৮ চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে বেলে, দো-আঁশ ও এঁটেল মাটিতেও এর চাষ করা যায়। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এই জাতের জন্য নির্বাচন করা উচিত। বীজ গজানোর জন্য মাটিতে অবশ্যই উপযুক্ত রস থাকা দরকার।

জমি তৈরি

সরিষার বীজ ছোট বিধায় জমি ভালোভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। পরপর ৪-৬টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হয়। জমিতে যাতে বড় ঢিলা ও আগাছা না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। মই দিয়ে জমি সমান করার পর ছোট ছোট প্লট করলে সেচ দেওয়া, পানি নিষ্কাশন ও অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যায় সুবিধা হয়।

বীজের গজানো বা অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা

জমিতে সঠিক সংখ্যার গাছ পেতে বপনের পূর্বে বীজের গজানোক্ষমতা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। বপনের সময় বীজের গজানো ক্ষমতা শতকারা ৮৫ ভাগ হওয়া উচিত। বীজের গজানো ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগের নিচে হলে বীজের হার বাড়িয়ে বপন করতে হয়।

- পরীক্ষার জন্য ১০০টি বীজ সংগ্রহ করুন।
- একটি মাটি/প্লাস্টিকের থালায় আবর্জনামুক্ত মাটি নিয়ে তাকে জো আসে এমন পরিমাণ পানি ছিটিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর ওপরের কিছু মাটি সরিয়ে বীজগুলো এমনভাবে ছড়িয়ে দিন যাতে বীজগুলো গায়ে গায়ে না লেগে থাকে। এবার ভিজা মাটি দিয়ে বীজগুলো ঢেকে দিন অথবা এক টুকরা কাপড় বা চট পানিতে ভিজিয়ে থালার ওপর বিছিয়ে দিন। বীজগুলো এমনভাবে ছড়িয়ে দিন যাতে বীজগুলো গায়ে গায়ে লেগে না থাকে। অন্য এক টুকরা কাপড় পানিতে ভিজিয়ে বীজের ওপর বিছিয়ে দিয়ে বীজগুলো ঢেকে দিন।

- বীজসহ থালাটির ওপর অন্য একটি থালা উপুড় করে দিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখুন। তিন/চার দিনের মধ্যে বীজগুলো গজিয়ে যাবে। উপরের থালাটি সরিয়ে গজানো বীজের সংখ্যা গণনা করুন।
- যতগুলো বীজ গজাবে সে সংখ্যাটিই বীজের গাজানো বা বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার শতকরা হার।

সারের পরিমাণ

বারি সরিষা-১৮ এর ভালো ফলন পেতে হলে নিম্নলিখিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে এবং সারের মাত্রা কৃষি পরিবেশ অঞ্চল এবং জমির উর্বরতাভেদে কম বেশি হতে পারে।

সারের নাম	হেক্টরপ্রতি (কেজি)	একরপ্রতি (কেজি)	বিঘাপ্রতি (কেজি)
ইউরিয়া	২০০-২৫০	৮০-১০০	২৬-৩৫
টিএসপি	১৫০-১৭০	৬০-৭০	২০-২৪
এমপি	৭০-৮৫	৩০-৩৫	১০-১২
জিপসাম	১২০-১৫০	৫০-৬০	১৭-২০
জিংক অক্সাইড	০-৫	০২	০.০-০.৬৭
বোরিক এসিড	০-৫	০-৩	১.২৫-১.৫০
পচা গোবর	৮-১০ (টন)	৩.২-৪.০ (টন)	১.১-১.৩ (টন)

নাইট্রোজেন সার সরিষার ফলন বৃদ্ধির জন্য দরকার। তবে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন প্রয়োগ করলে গাছ হেলে পড়ে, পরিপক্বতার সময় বিলম্বিত হয় এবং তেলের পরিমাণ কমে যায়। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ফসফরাস সার দরকার, যেহেতু সরিষার শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে সেজন্য বীজ বপনের পূর্বে ফসফরাস সার প্রয়োগ করতে হয় যাতে মাটির গভীরে অবস্থিত শিকড় ভালোভাবে ফসফরাস সার গ্রহণ করতে পারে। তবে অতিরিক্ত প্রয়োগে এ সার সরিষার তেলের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেয়। সরিষার বেশি ফলনের জন্য সালফার ও বোরন সারের ব্যবহার অপরিহার্য।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সরিষা ফুল আসার পূর্ব পর্যন্ত তাড়াতাড়ি শারীরিক বৃদ্ধির জন্য বেশিরভাগ সার গ্রহণ করে থাকে। সেজন্য অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সারের সবটুকু শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে এবং বাকি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ হিসেবে চারা গজানোর ২০-২২ দিন পর অর্থাৎ ফুল আসার আগেই প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগের সময় জমিতে রস থাকা বাঞ্ছনীয়। রস কম থাকলে হালকা সেচ দেওয়ার পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বপনের সময়

সরিষার বপন সময় শীত শুরুর সঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণত আশ্বিন মাসের শেষ থেকে কার্তিক মাসের শেষ পর্যন্ত (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেমবর) এ জাত বপন করার উপযুক্ত সময়। দেরিতে বপন করলে ফলন কমে যায়। দেশের উত্তর অঞ্চলে যেহেতু শীত আগে আসে, সেখানে আগাম বপন করা সম্ভব। আমন ধান কাটার পর বেশি দেরি না করে সরিষা বপন করা উচিত।

বীজের হার

হেক্টরপ্রতি (কেজি)	একরপ্রতি (কেজি)	বিঘাপ্রতি (কেজি)
৬.০০-৭.০০	২.১-২.৪০	০.৭০-০.৮০

বপন পদ্ধতি

সারিতে এবং ছিটিয়ে উভয় প্রকারেই সরিষার বীজ বপন করা যায়। সারিতে বুনলে এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ৩০ সেমি এবং সারিতে বীজ লাগাতার বপন করতে হয়। সারিতে বুনলে পরবর্তীতে আগাছা দমন ও অন্তবর্তী পরিচর্যা করা সহজ হয়। সারি তৈরির জন্য লোহার তৈরি টাইন অথবা ছোট কাঠের লাঙ্গল ব্যবহার করা যেতে পারে। আড়াই থেকে তিন সেমি গভীরে বীজ বপন করার পর মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে শেষ চাষের পর বীজ বপন করতে হবে এবং মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। সরিষার বীজ ছোট বিধায় বপনের সুবিধার জন্য বীজের সংগে ঝুরঝুরে মাটি অথবা ছাই মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সেচ প্রয়োগ

সরিষার ফলন বৃদ্ধির জন্য মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকা প্রয়োজন। সাধারণত মাটিতে যে রস থাকে তার মাধ্যমে আমাদের দেশে সরিষার চাষাবাদ করা হয়। বর্তমানে যেখানে সেচের সুযোগ রয়েছে, সেখানে উন্নত জাতের সরিষা সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হয়। সেচ অধিক দিন গাছে পাতা ধরে রাখতে সাহায্য করে তাতে সরিষার ফলন অধিক হয়।

জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে সেচ প্রয়োগ করতে হয়। কখনো কখনো বপনের সময় জমিতে রসের অভাব থাকে, সেক্ষেত্রে বপনের আগেই সেচ দিয়ে রসের ব্যবস্থা করতে হবে। ফুল আসার আগে অর্থাৎ বপন করার ১৮-২০ দিন পর এবং শুঁটি হওয়ার সময় ৫০-৫৫ দিনে জমিতে রস থাকা প্রয়োজন। কাজেই এ সময়ে জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে সেচ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সরিষার জমিতে সাধারণত প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়। তবে লক্ষ রাখতে হবে যাতে সেচের পানি জমিতে আটকে না থাকে। ফোয়ারা পদ্ধতিতে সরিষার জমিতে সেচ দেওয়া উত্তম।

পরিচর্যা

চারা গজানোর ১০-১২ দিনের মধ্যে প্রথমবার এবং ২০-২৫ দিনে দ্বিতীয় বার নিড়ানি দিয়ে অতিরিক্ত চারা এবং আগাছা উঠিয়ে ফেলতে হবে। প্রতি বর্গমিটার জমিতে ৫০-৬০টি সরিষার গাছ থাকা বাঞ্ছনীয়।

সেচ দেওয়ার পর জমিতে জো আসার সাথে সাথে কোদাল অথবা নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে দিলে জমিতে বেশি দিন পানি ধরে রাখা যায়। বাড়ন্ত অবস্থায় লক্ষ রাখতে হবে যেন পোকামাকড় ও রোগবালাই ফসলের ক্ষতি না করে।

ফসল কর্তন, বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ

পরিপক্বতার সময় অনুকূল আবহাওয়ায় সরিষা আগাম বপন করলে পরিপক্বতা দেরি হয় কিন্তু দেরিতে বপন করলে অল্প সময়ে পরিপক্বতা আসে। আগাম বপন করলে সরিষা গাছের বৃদ্ধি বেশি হয় এবং দেরিতে বপন করলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির চেয়ে কম হয়ে থাকে। এ জাতের সরিষার পরিপক্বতার সময় ৯৫-১০০ দিন। সরিষার ফলন এবং বীজের গুণাগতমান বপনের সময় এবং কর্তন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে।

যখন গাছের শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ শুঁটি খড়ের রং ধারণ করে তখনই সরিষা কাটতে হবে। এ অবস্থা থেকে দেরি করলে বীজ ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সকালে শুটিসহ গাছ কেটে বা উপড়িয়ে মাড়াই করার স্থানে দিতে হবে এবং গাদা দিয়ে ২ থেকে ৩ দিন রাখতে হবে। পরে দুদিন রোদে গাছ শুকিয়ে গরু দিয়ে মাড়াই করতে হবে। এ সময় বীজের মধ্যে পানির পরিমাণ ২০% অধিক থাকা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে যে, শুঁটি যাতে মাঠে অতিরিক্ত পেকে না যায়। বেশি পেকে গেলে, বীজ ক্ষেতে ঝরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাঁশের লাঠি দিয়ে পিটিয়েও সরিষা মাড়াই করা যায়। বীজ কুলা দিয়ে ঝেড়ে রোদে ভালোভাবে তিন-চার দিন শুকিয়ে নেবার পর ঠান্ডা করে শুষ্ক পাত্রে সংরক্ষণ করা উত্তম। সরিষার শুকানো বীজ অর্থাৎ ৮-১০% আর্দ্রতাসহ যেকোনো পরিষ্কার শুকনো পাত্রে ঘরের শীতল স্থানে রাখলে বেশি সময় অর্থাৎ ২-৩ বছর বীজ সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত বীজ মাঝেমধ্যে শুকিয়ে আবার সংরক্ষণ করতে হয়।

তেল ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল

সরিষা
সরিষার উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি:
সরিষা বেলে দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটিতে ভালো জন্মে।

জমি তৈরি:
জমির প্রকারভেদে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হবে। জমির চারপাশে নালার ব্যবস্থা করলে পরবর্তীকালে সেচ দিতে এবং পানি নিষ্কাশনে সুবিধা হয়।

বপন পদ্ধতি:
সরিষা বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। সারি করে বুনলে সার, সেচ ও নিড়ানি দিতে সুবিধা হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি রাখতে হবে। বপনের সময় জমিতে বীজের অঙ্কুরোদগমের উপযোগী রস থাকতে হবে।

বপনের সময়:
বিভিন্ন অঞ্চলের তারতম্য এবং জমির 'জো' অবস্থা অনুসারে টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা, বারি সরিষা-৬, বারি সরিষা-৭, বারি সরিষা-৮, বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৭ ও বারি সরিষা-১৮-এর বীজ মধ্য-আশ্বিন থেকে কার্তিক মাস (অক্টোবর থেকে নভেম্বর) পর্যন্ত বোনা যায়। বারি সরিষা-১১, বারি সরিষা-১৬, রাই-৫ এবং দৌলত কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ (মধ্য-অক্টোবর থেকে নভেম্বর) মাস পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলের তারতম্য এবং জমির 'জো' অবস্থা অনুসারে বারি সরিষা-১১, বারি সরিষা-১৩ ও বারি সরিষা-১৬ জাতের বীজ কার্তিক মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর) বপনের উপযুক্ত সময়।

সারের পরিমাণ:
জাত, মাটি ও মাটিতে রসের তারতম্য অনুসারে সার দিতে হয়। সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর) নিম্নরূপ:

সারের নাম	সোনালি সরিষা, বারি সরিষা-(৬, ৭, ৮, ১১, ১২, ১৩ ও ১৬)	টরি-৭, কল্যাণীয়া, রাই-৫, দৌলত বারি সরিষা-(৯, ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮)
ইউরিয়া	২৫০-৩০০	২০০-২৫০
টিএসপি	১৭০-১৮০	১৫০-১৭০
এমওপি	৮৫-১০০	৭০-৮৫
জিপসাম	১৫০-১৮০	১২০-১৫০
জিংক সালফেট	৫-৭	৪-৫
বোরিক এসিড (প্রয়োজনবোধে)	১০	১০
পচা গোবর	৮-১০ টন	৮-১০ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: ইউরিয়া সার অর্ধেক ও অন্যান্য সার বপনের আগে এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া গাছে ফুল আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার উপরি প্রয়োগের সময় মাটিতে রস থাকা দরকার।

বীজের হার: টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা, বারি সরিষা-৬, বারি সরিষা-৭, বারি সরিষা-৮, বারি সরিষা-১১,বারি সরিষা-১৩, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৬, বারি সরিষা-১৭ এবং বারি সরিষা-১৭ এর জন্যপ্রতি হেক্টরে ৬-৭ কেজি বীজ লাগে। রাই ও দৌলত সরিষার জন্য প্রতি হেক্টরে ৭-৮ কেজি বীজের প্রয়োজন। অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর একবার এবং ফুল আসার আগে ২০-২৫ দিন দ্বিতীয় বার নিড়ানি দিতে হয়।

সেচ প্রয়োগঃ
সোনালি সরিষা, বারি সরিষা-৬, বারি সরিষা-৭, বারি সরিষা-৮, বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১১, বারি সরিষা-১২, বারি সরিষা-১৩, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৬ ও বারি সরিষা-১৭ উফশী জাতসমূহে পানি সেচ দিলে ফলন বেশি হয়। বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (গাছে ফুল আসার আগে) প্রথম সেচ এবং ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে (ফল ধরার সময়) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে। বপনের সময় মাটিতে রস কম থাকলে একটি হালকা সেচ দিতে হয়।

ফসল সংগ্রহঃ
টরি জাতীয় সরিষা ৭০-৯০ দিন এবং রাই জাতীয় সরিষা ৯০-১২০ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়।

বীজ সংরক্ষণঃ
মাড়াই করার পর রোদে শুকানো বীজ গরম অবস্থায় সংরক্ষণ করলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে প্লাস্টিকের পাত্রে, টিনে বা ড্রামে রেখে মুখ এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যেন পাত্রের ভিতরে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে। সংরক্ষণের জন্য বীজভর্তি পাত্র মাটির সংস্পর্শে রাখা বাঞ্ছনীয়। বীজসহ পাত্র আর্দ্রতা কম এমন ঘরের শীতল স্থানে রাখলে ১ বছর এমনকি ২ বছর পর্যন্ত বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বজায় থাকে।

তিল ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটিঃ
পানি জমে থাকে না এমন ধরনের মাটিতে তিলের চাষ করা যায়। উঁচু বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটি তিল চাষের জন্য বেশি উপযোগী।

জমি তৈরিঃ
তিল চাষের জন্য মাটি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে নিতে হয়।

বপনের সময়ঃ
তিল খরিফ মৌসুমে চাষ করা যায়। খরিফ-১ মৌসুমে অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে (মধ্য-ফেব্রুয়ারি হতে মধ্য-এপ্রিল), খরিফ-২ মৌসুমে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে (মধ্য অগস্ট হতে মধ্য-সেপ্টেম্বর) তিলের বীজ বপনের উত্তম সময়।

বপন পদ্ধতিঃ
তিলের বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বপন করা হয়। তবে সারিতে বপন করলে অন্তর্বর্তীকালীন অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৫ সেমি রাখতে হবে।

বীজের হারঃ প্রতি হেক্টরে ৭.০-৮.০ কেজি।

সারের পরিমাণঃ তিলের জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে:

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১০০-১২৫ কেজি
টিএসপি	১৩০-১৫০ কেজি
এমওপি	৪০-৫০ কেজি
জিপসাম	১০০-১১০ কেজি
জিংক সালফেট (প্রয়োজনে)	০-৫ কেজি
বোরিক এসিড (প্রয়োজনে)	৮-১০ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি:

ইউরিয়া সারের অর্ধেক ও বাকি সব সার জমি শেষ চাষের সময় ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর ফুল আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সেচ প্রয়োগ ও পানি নিষ্কাশন: জমিতে রসের অভাব হলে বীজ বোনার সময় হালকা সেচ দিয়ে বীজ বপন করতে হয়। জমিতে রস না থাকলে ৫৫-৬০ দিন পর ফল ধরার সময় আর একবার সেচ দেওয়া যেতে পারে। ফসল সংগ্রহ: তিল ফসল সংগ্রহ করতে ৮৫-৯০ দিন সময় লাগে।

চীনাবাদাম
উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি:

বেলে- দো-আঁশ মাটি, ক্যালসিয়াম ও জৈব পদার্থসমৃদ্ধ মাটি চীনাবাদাম উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত। চীনাবাদাম জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। বেলে দো-আঁশ মাটিতে সহজে শিকড় ও পেগ প্রবেশ করতে পারে বিধায় চীনাবাদাম অধিক ফলন দেয়। এ ফসল পিএইচ ৬.০-৬.৫ এ ভালো হয়। জমি তৈরি: জমিতে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুর করে নিতে হবে। শেষ চাষের সময় মই দিয়ে সমান করে জমির চারপাশে নালার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরবর্তীতে সেচ ও অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে পানি নিষ্কাশনে সুবিধা হয়।

বপনের সময়:

চীনাবাদাম রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে আবাদ করা যায়। রবি মৌসুমে কার্তিক অগ্রহায়ণ, খরিফ-১ মৌসুমে ফাল্গুন-চৈত্র ও খরিফ-২ মৌসুমে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বপন করতে হয়। তবে দেবীগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ ফসল জানুয়ারিতে বপন করা হয়। রবি মৌসুমে কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে বপন করলে ফলন ভালো পাওয়া যায় এবং জীবনকাল প্রায় ১৫-২০ দিন কমে আসে।

বীজের হার:

বারি চীনাবাদাম-৮ চাষে হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি বা একরপ্রতি ৪০ কেজি খোসাসহ বীজের প্রয়োজন হয়। প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যা ১,১০,০০০-১,২০,০০০ থাকা দরকার।

বপন পদ্ধতি:

বীজ বপনের আগে খোসা হতে বীজ আলাদা করে নিতে হবে। বীজ ও খোসার অনুপাত ৭:৩ অর্থাৎ ১০ কেজি খোসাসহ বাদামের ৭ কেজি বীজ পাওয়া যায়। বীজ সারিতে বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি এবং গাছ হতে গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি। বীজ ২.৫ থেকে ৩.০ সেমি মাটির গভীরে বপন করতে হয়। প্রতি গর্তে একটি করেপুষ্ট বীজ বপন করতে হয়।

সারের পরিমাণঃ

চীনাবাদামের জমিতে নিচে উল্লিখিত হারে সার ব্যবহার করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

সারের নাম	হেক্টরপ্রতি (কেজি)	একরপ্রতি (কেজি)	বিঘাপ্রতি (কেজি)
ইউরিয়া	২৫	১০	৩.৫
টিএসপি	১৬০	৬৪	১২
এমওপি	৮৫	৩৪	১৬
জিপসাম	৩০০	১২০	৪০
বোরিক এসিড (প্রয়োজনে)	১০	৪	১.৪

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সারের সবটুকু শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয় এবং বাকি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ হিসবে চারা গজানোর ৪০-৫০ দিন পর গাছে ফুল আসার সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে প্রতি কেজি বীজে ৭০ গ্রাম অণুজীব সার ব্যবহার করা যেতে পারে। অণুজীব সার ব্যবহার করলে সাধারণত ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হয় না।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

আগাছা দমনঃ

চীনাবাদামের ফলন ভালো পাওয়ার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে গাছ বৃদ্ধির সময় জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চারা গজানোর পর প্রয়োজনবোধে দুই বার (১ম বার ১৪-২০ দিন পর এবং ২য় বার ৩৫-৪০ দিন পর) জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। ফুল আসার পর গাছে বাদাম ধরার সময় গোড়ায় হালকাভাবে মাটি তুলে দিলে বাদামের ফলন ভালো হয়।

সেচঃ

বপন করার ১৮-২০ দিন পর ১ বার এবং শুঁটি হওয়ার ৫০-৫৫ দিন পর ২য় বার সেচ দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও বীজ সংরক্ষণঃ

চীনাবাদাম গাছের শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ বাদাম যখন পরিপক্ব হয়, তখন ওঠানোর সঠিক সময়। এ সময় গাছের নিচের পাতাগুলো হলুদ রং ধারণ করে এবং ঝরে পড়তে শুরু করে। বাদামের খোসার শিরা উপ উপশিরাগুলো সুস্পষ্ট দেখা যায়। বাদামের খোসা ভাঙার পর খোসার ভেতরে কালচে বর্ণের দাগ দেখা যায় এবং বীজের ওপরের আবরণ বাদামি রং ধারণ করে। খোসাসহ পরিপক্ব পুষ্ট বাদাম উজ্জ্বল রোদে ১ম ও ২য় দিন দৈনিক ৪ ঘণ্টা, তৃতীয় দিন থেকে দৈনিক ৮ ঘণ্টা উজ্জ্বল রোদে মোট ৭-৮ দিন শুকাতে হয়। এভাবে বীজের আর্দ্রতা ৮-৯ শতাংশে নেমে আসবে। বাদাম শুকানোর সময় সরাসরি সিমেন্টের মেঝেতে না রেখে চট বা ত্রিপল এর ওপর রোদে শুকাতে হয়। রোদে শুকানোর পরে বাদাম ঠান্ডা করে গুদামজাত করতে হয়। বাদাম বীজ সংরক্ষণের জন্য পলিথিন আচ্ছাদিত বা সিনথেটিক ব্যাগ, চটের বস্তা, কেরোসিন টিন বা ড্রাম, পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। বাদাম বীজসহ চটের বস্তা কাঠের বা বাঁশের মাচায় রেখে দিতে হয়। পলিথিন ব্যাগ, টিনের ড্রাম, কেরোসিন টিন প্রভৃতিতে বীজ সংরক্ষণ করলে বীজের মান বা গুণাগুণ এক বছরের অধিক সময় অক্ষুণ্ন থাকে।

তেল ফসলের প্রধান প্রধান রোগ ও তার প্রতিকার

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে তেল ফসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে আবাদি তেল ফসলসমূহ হচ্ছে সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, সয়াবিন, কুসুম ফুল, গর্জন তিল ও তিসি। ২০২১-২২ বছর প্রায় ৮.৬১ লক্ষ হেক্টর জমিতে এসব ফসলের চাষ হয় এবং প্রায় ১২.৩২ লক্ষ মে. টন ভোজ্যতেল উৎপাদিত হয়। এ উৎপাদন দেশের মোট চাহিদার তুলনায় মাত্র ১২%। ফলে প্রায় ২২ হাজার কোটির আর্থিক পরিমাণ টাকার তেল ও তেলবীজ আমদানি করতে হয়।

প্রতিবছর ফসলের রোগের কারণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফসলহানি ঘটে। আমাদের দেশের কৃষি নিবিড়তা ও উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফসলের রোগবালাইয়ের সংখ্যাও সেই সাথে বেড়ে চলেছে। ফসলের রোগের অন্যতম কারণগুলো হলো ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও নেমটোড। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ফসলের পুরানো রোগের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের নতুন রোগের আবির্ভাব ঘটছে এবং কম মারাত্মক রোগসমূহ বেশি মারাত্মক রোগে পরিণত হচ্ছে। অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় ফসলের রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক বালাইনাশক, সঠিক মাত্রায়, সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়না। ফলে কার্যকরভাবে রোগ দমন সম্ভব হয়না এবং এতে উৎপাদন খরচও বেড়ে যায়। বীজবাহিত রোগসহ ফসলের রোগসমূহ কার্যকরভাবে দমন করতে পারলে প্রায় ২০-৩০% ফসল উৎপাদন করা সম্ভব।

সরিষা

সরিষা বাংলাদেশের প্রধান ভোজ্যতেল ফসল। বর্তমানে ২.৩৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে এর চাষ করা হয় এবং ২.০৩ লক্ষ টন তেল পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সরিষার ফলন প্রতি হেক্টরে গড়ে ১.১৩৬ কেজি। এদেশে ২ প্রকার সরিষার চাষ হয়, যথা- টরি (পিঙ্গল ও শ্বেত) ও রাই। বর্তমানে আবাদযোগ্য নেপাস সরিষার জাতও উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং তাআবাদ করা হচ্ছে।

সরিষার গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ

(১) সরিষার পাতা ঝলসানো রোগঃ

লক্ষণঃ

অলটারনেরিয়া ব্রাসিসি নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক অবস্থায় সরিষা গাছের নিচে বয়স্ক পাতায় এ রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে এ ছত্রাকের আক্রমণে গাছের পাতা, কাণ্ড ও ফলে চক্রাকার কালচে দাগের সৃষ্টি হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পাতা ঝলসে যায়। ফলে সরিষার ফলন খুব কমে যায়। আক্রান্ত বীজ, বিকল্প পোষক ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। বৃষ্টি ও ঠান্ডা আবহাওয়া এ রোগ বৃদ্ধির সহায়ক।

দমন প্রযুক্তিঃ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের সরিষার চাষ করতে হবে। রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে প্রোভেঙ-২০০ ডব্লিউপি ছত্রাকনাশক দিয়ে (২-৩ গ্রাম ছত্রাকনাশক/কেজি বীজ) বীজ শোধন করে বপন করতে হবে। এ রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল-৫০ ডব্লিউপি ০.২% হারে (প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম) পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পরপর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

(২) সরিষার কাণ্ড পঁচা রোগ

লক্ষণঃ

স্কেলরোটিনিয়া স্কেলরোশিওরাম নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। এটি বীজ ও মাটিবাহিত রোগ। বাড়ন্ত গাছে ফুল ধরার সময় আক্রমণ বেশি দেখা যায়। আক্রমণের স্থলে সাদা তুলার মতো মাইসেলিয়াম দেখা যায়। ফলে গাছ পচে মারা যায়। আক্রান্ত গাছের কাণ্ড চিরলে কালো রঙের স্কেলেরোশিয়া দেখা যায়। তাপমাত্রা (১৫-১৮০সে.) ও আর্দ্রতা (৮০-৯০%) আবহাওয়ায় এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে।

দমন প্রযুক্তি:

এই ছত্রাকটি সাধারণত মাটির উপরিভাগে সুপ্তাবস্থায় থাকে। সুতরাং মাটিকে গভীর চাষের মাধ্যমে রোগরে উৎস নষ্ট করে আক্রমণ কমানো যায়। মাটি ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে রাখা যাবেনা। বপনের পূর্বে প্রোভেঙ-২০০-এর মাধ্যমে বীজ শোধন করতে হবে (২.৫ গ্রাম/কেজি বীজ)। রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল ২.০ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩ বার (বৃদ্ধি পর্যায়ে, ফুল ও পড ধরার পর্যায়) প্রয়োগ করলে সরিষার কাণ্ড পচা রোগ দমন হয়।

(৩) পরজীবী উদ্ভিদজনিত রোগ

লক্ষণ:

সরিষার পরজীবী উদ্ভিদের মধ্যে অরোবাংকিই প্রধান। সরিষা গাছের শিকড়ের সাথে এ পরজীবী উদ্ভিদ সংযোগ স্থাপন করে খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। এর ফলে পরজীবী আক্রান্ত সরিষার গাছ দুর্বল হয়, বৃদ্ধি কমে যায় এবং ফলন হ্রাস পায়। অরোবাংকি এক প্রকার সপুষ্পক পরজীবী উদ্ভিদ এবং এর বংশবৃদ্ধি সরিষা গাছের ওপর নির্ভরশীল। অরোবাংকির বীজ মাটিতেই অবস্থান করে। মাটি, ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, সেচের পানি প্রভৃতির মাধ্যমে অরোবাংকির উৎপত্তি ও বিস্তার ঘটে। বারবার একই জমিতে সরিষা পরিবারের ফসল চাষ করলে এ পরজীবীর বিস্তার ঘটে।

দমন প্রযুক্তি:

বীজ বপনের পূর্বে গভীরভাবে জমি চাষ করতে হবে। এতে পরজীবীর বীজ গভীরে চলে যাবে এবং সরিষার শিকড়ের সংস্পর্শে আসতে পারবেনা। ফুল আসার পূর্বে পরজীবী উদ্ভিদ জমি হতে তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। টিএসপি সার পরিমিত হারে (২৫০ কেজি/হে.) ব্যবহার করতে হবে। পূর্বে এ রোগ আক্রান্ত জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে। আগাছানাশক যেমন ২. ৪-ডি ছিটিয়ে পরজীবী উদ্ভিদ দমন করতে হবে।

তিল

তিল বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম ভোজ্যতেল ফসল। বাংলাদেশে খরিফ এবং রবি উভয় মৌসুমেই তিলের চাষ করা হয়। তবে বর্তমানে দুই-তৃতীয়াংশ তিলের আবাদ খরিফ মৌসুমে হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই তিলের চাষ হয়। আমাদের দেশে সাধারণত কালো ও খয়েরি রঙের বীজের তিলের চাষ বেশি হয়।

তিলের গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ

(১) তিলের পাতার দাগ রোগ

লক্ষণ:

সারকোস্পোরা সিসেমী নামক এক প্রকার ছত্রাকের কারণে তিলের এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগ বীজ ও মাটিবাহিত। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতা ছোট, গোলাকার, বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি রঙের দাগ পড়ে। দাগ বিভিন্ন আকারের হয় এবং ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। ফলে সম্পূর্ণ পাতা পুড়ে যায়।

দমন প্রযুক্তি:

এ রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ১ গ্রাম হারে অটোস্টিন প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর জমিতে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষ করতে হবে।

(২) তিলের কাণ্ড পচা রোগ দমন

লক্ষণ:

তিল গাছ কাণ্ড পচা রোগে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে। ম্যাক্রোফোমিনা ফ্যাসিওলিনা নামক ছত্রাকের কারণে এ রোগ সৃষ্টি হয়। এটি একটি মাটি ও বীজবাহিত রোগ। আক্রান্ত গাছের কান্ড ছোট, লম্বা আঁকাবাঁকা বিভিন্ন ধরনের গাঢ় খয়েরি ও কালচে দাগ দেখা যায়। এ দাগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং সমস্ত কাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। কাণ্ড পচে সম্পূর্ণ গাছই মরে যায়।

দমন প্রযুক্তি:

বীজ বপনের পূর্বে প্রোভেন্ড-২০০ ডব্লিউপি ছত্রাকনাশক দ্বারা (২-৩ গ্রাম/কেজি) বীজ শোধনের মাধ্যমে রোগের আক্রমণ কমানো যায়। এ রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ১ গ্রাম হারে অটোস্টিন বা ২ গ্রাম হারে ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ফসল কাটার পর গাছের শিকড়, আগাছা, আবর্জনা ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সাধারণত মাঝারি থেকে ভারি বর্ষণ হলে এ রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে বিধায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখা গেলে বৃষ্টির কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা আগে ডাইথেন এম-৪৫ বা ইনডোফিল নামক ছত্রাকনাশক ০.২% হারে স্প্রে করতে হবে। গাছে ফুল আসার পূর্ব থেকে ১২-১৫ দিন পরপর ডাইথেন এম-৪৫ বা ইনডোফিল (০.২%) ৪-৫ বার স্প্রে করা হলে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

চীনাবাদাম

চীনাবাদাম একটি অর্থকরী ফসল। এটি একটি উৎকৃষ্ট ভোজ্য তেলবীজ। বীজে ৪৮-৫০% তেল ও ২২-২৯% আমিষ রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমিতে চীনাবাদাম চাষ করা হয়।

চীনাবাদামের গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ

১) পাতার দাগ রোগ

লক্ষণ:

সারকস্পোরা এরাচিডিকোলা ও সারকস্পোরা পারসোনেটা নামক দুইটি ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। এ ছত্রাকের আক্রমণে সবুজ পাতার উপরিভাগে প্রথম থেকেই হলুদ বর্ণের বৃত্তাকার রেখা দ্বারা ঘেরা গাঢ় বাদামি রঙের দাগের আবির্ভাব হয়। দাগগুলো নানা আকারের হয় এবং পাতার ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণের ফলে গাছের পাতা শুকিয়ে তাড়াতাড়ি ঝরে যায়। ফলে গাছের পাতায় খাদ্য তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটে এবং গাছের গোড়ায় বাদাম পুষ্ট হতে পারে না। বাদাম অপরিপক্ব অবস্থায় থাকে। ফলে বাদামের ফলন ১০-১৫% কম হয়। রোগটি মাটিবাহিত। গাছের অবশিষ্টাংশ যা মাটিতে পড়ে থাকে তা থেকে কনিডিয়ার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে গাছকে আক্রান্ত করে। কনিডিয়া বাতাস ও বৃষ্টির পানির মাধ্যমে একস্থান হতে অন্য স্থানে ছড়িয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া এবং প্রবল বায়ুপ্রবাহ এ রোগ বৃদ্ধির সহায়ক।

দমন প্রযুক্তি:

ঝিঙাবাদাম ও বারি চীনাবাদাম-৭ জাত দুটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল। এ দুটি জাতের চাষাবাদের মাধ্যমে রোগের আক্রমণ এড়ানো যায় এবং অধিক ফলন পাওয়া যায়। এ রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে গাছে অটোস্টিন (১ গ্রাম হারে)। কন্টাফ (০.৫ মিলি হারে (১মিলি হারে) প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৩ বার ছিটালে এ রোগের অনিষ্ট থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়। যেহেতু জমিতে আক্রান্ত গাছে পরিত্যক্ত অংশের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় সেহেতু মৌসুমের শেষে আক্রান্ত গাছসমূহ এবং আগাছা পুড়ে ফেলে বা নষ্ট করে রোগের বিস্তার রোধ করা যায়। একই জমিতে প্রতিবছর চীনাবাদামের চাষ না করে অন্য ফসল দিয়ে শস্য পর্যায়ক্রম গ্রহণ করলে উপর্যুক্ত পোষকের অভাবে অনেক জীবাণু মারা যায় ফলে রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়।

(২) রাস্ট বা মরিচা রোগ

লক্ষণ:

পাকসিনিয়া এরাচিডিস নামক ছত্রাকের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত বয়স্ক গাছে এ রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় পাতার নিম্ন পৃষ্ঠে লাল, লোহার মরিচা পড়ার ন্যায় সামান্য স্ফীত ছোট বিন্দুর মতো অসংখ্য দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এ রোগের কারণে চীনাবাদামের ফলন প্রায় ৫০% পর্যন্তকম হতে পারে। ফসল কাটার পর এ রোগের ছত্রাক আগাছা, আবর্জনা এবং ফসলের পরিত্যক্ত অংশে আশ্রয় নেয়। বিকল্প পোষক হতে বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ সুস্থ গাছে ছড়ায় এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় বিস্তার লাভ করে।

দমন প্রযুক্তি:

ঝিঙা বাদাম জাতটি রাস্ট বা মরিচা রোগ প্রতিরোধী। এ জাতের চাষ করে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে টিল্ট/কন্টাফ/ক্রীজল শতকরা ০.০৫ ভাগ হারে (প্রতি লিটার পানির সাথে ০.৫ মিলি ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে ১২-১৫ দিন অন্তর ৩ বার ছিটালে এ রোগের প্রকোপ কমে যায়। পূর্ববর্তী ফসল থেকে স্বেচ্ছায় গজানো গাছ, আগাছা এবং আবর্জনা পুড়ে ফেলে এ রোগের উৎস নষ্ট করা যায়।

(৩) গোড়া পচা/কাণ্ড পচা রোগ

লক্ষণ:

স্কেলেরোশিয়াম রলফসি নামক মাটিতে বসবাসকারী এক প্রকার ছত্রাকের কারণে এ রোগ হয়। এটা সরিষাদানার মতো স্কেলেরোশিয়া উৎপন্ন করে। মাইসেলিয়াম একত্রীভূত হয়ে মাইসেলিয়ামগুচ্ছ তৈরি করে যা শক্ত হয়ে স্কেলেরোশিয়াম উৎপন্ন হয়। গাছের গোড়ায় বা মাটির ছত্রাকের সাদা মাইসেলিয়াম এবং সরিষার দানার মতো ছত্রাক গুটিকা (স্কে - লরোশিয়া) লক্ষ করা যায়। এ রোগের কারণে গাছের মূল শিকড় আক্রান্ত হলে গোড়া পচে যায় ও গাছ সম্পূর্ণ ঢলে পড়ে এবং পরবর্তীতে খাদ্য ও পানি চলাচলের প্রতিবন্ধকতার কারণে গাছ মরে যায়। এ রোগের কারণে ২৫-৩০% এর ওপর ফলনের ক্ষতি হতে পারে।

দমন প্রযুক্তি:

জমি তৈরির সময় গভীর চাষের মাধ্যমে মাটি আলগা করে ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে রোগের উৎস নষ্ট করে আক্রমণ কমানো যায়। বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পূর্বে মুরগির বিষ্ঠা ৫ টন/হেক্টর বা সরিষার খৈল ১ টন/হেক্টর প্রয়োগ এবং প্রোভেক্ত-২০০ ডব্লিউপি ছত্রাকনাশক (২.৫ গ্রাম ছত্রাকনাশক/কেজি বীজ) দ্বারা বীজ শোধন করে বপন করে বাদামের গোড়া পচা রোগ দমন করা যায়। পূর্ববর্তী ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, আগাছা এবং আবর্জনা পুড়িয়ে নষ্ট করে রোগের বিস্তার রোধ করা যায়। জমিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে শস্য চাষ করলে উপযুক্ত পোষকের অভাবে রোগজীবাণু মরে যায়। ফলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

সূর্যমুখী

সূর্যমুখী একটি উৎকৃষ্ট তেল ফসল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সূর্যমুখীর ব্যাপক চাষ হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে সূর্যমুখী একটি তেল ফসল হিসেবে বাংলাদেশে আবাদ হচ্ছে। বর্তমানে পটুয়াখালী, রাজশাহী, যশোর, কুষ্টিয়া, নাটোর, পাবনা, দিনাজপুর, গাজীপুর, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জেলাতে সীমিত আকারে চাষ হচ্ছে। সূর্যমুখীর হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ১.৭-১.৯ টন।

সূর্যমুখীর গুরত্বপূর্ণ রোগসমূহ ও তার দমন প্রযুক্তি

(১) সূর্যমুখীর পাতা ঝলসানো রোগ দমন

লক্ষণ:

আমাদের দেশে সূর্যমুখীর রোগের মধ্যে পাতা ঝলসানো রোগটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অলটারনেরিয়া হেলিয়ান্থি নামক ছত্রাকের আক্রমণে সূর্যমুখীর এ রোগটি হয়ে থাকে। রোগটি বীজ ও বায়ুবাহিত। রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতায় ধূসর বা গাঢ় বাদামি বর্ণের অসম আকৃতির দাগ পড়ে। পরে দাগ মিশে গিয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। অবশেষে সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে যায় এবং গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে।

দমন প্রযুক্তি:

রোগ সহনশীল বারি সূর্যমুখী-২ জাত চাষ করতে হবে। রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল-৫০ ডব্লিউপি অথবা এন্ডফিল (২% হারে) পানির সাথে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার পাতায় প্রয়োগ করলে রোগের প্রকোপ কমে যায়। ফসল কাটার পর গাছের পরিত্যক্ত অংশ নষ্ট করলে বা পুড়িয়ে ফেললে এ রোগের উৎস নষ্ট হয়ে যায়।

(২) সূর্যমুখীর শিকড় পচা রোগ দমন

লক্ষণ:

সাধারণত স্কেলেরোশিয়াম রলফসি নামক ছত্রাকের কারণে সূর্যমুখীর এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত গাছের গোড়ায় সাদা তুলার মতেরা ছত্রাকের মাইসেলিয়াম এবং গোলাকার সরিষার দানারমতো স্কিলেরোশিয়াম দেখা যায়। প্রথমে গাছ কিছুটা নেতিয়ে পড়ে। কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত গাছ চলে পড়ে এবং শুকিয়ে মারা যায়।

দমন প্রযুক্তি:

প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউপি @ ৩ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে এর সাহায্যে বীজ শোধনের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার রোধ করা যায়। জমির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে কারণ ভেজা স্যাঁতসেঁতে জমিতে রোগের প্রকোপ বেশি হয়। পর্যায়ক্রমিকভাবে ফসলের চাষ করলে উপযুক্ত পোষক গাছের অভাবে পূর্ববর্তী আক্রমণকারী রোগের বিস্তার রোধ করা যায়। রোগ দেখা মাত্র অটস্টিন ৫০ ডব্লি-উডিজি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর গাছের গোড়ায় মাটিতে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

সয়াবিন

বাংলাদেশে সয়াবিন একটি সম্ভাবনাময় ফসল। আমিষ ও ভোজ্যতেল উৎপাদনে সয়াবিন এখন অনেক দেশেই একটি প্রধান ফসল। সয়াবিনে ৪০-৪৫% আমিষ এবং ১৯-২২% তেল রয়েছে। অন্যান্য ডাল ও শুঁটিজাতীয় শস্যের তুলনায় সয়াবিন দ্বিগুণ আমিষসম্পন্ন অথচ দাম কম। তাই স্বল্প মূল্যে আমিষ সরবরাহের লক্ষ্যে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে সয়াবিন চাষ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে সয়াবিনের হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৫-২.৩ টন। মোট আবাদি জমির পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর এবং উৎপাদন প্রায় ৫৯ হাজার টন।

সয়াবিনের গুরত্বপূর্ণ রোগসমূহ ও তার দমন প্রযুক্তি

(১) হলুদ মোজাইক ভাইরাস

লক্ষণ:

হলুদ মোজাইক ভাইরাস দ্বারা রোগটি হয়ে থাকে। সবুজ পত্রফলকের উপরিভাগে উজ্জ্বল সোনালি বা হলুদ রঙের চক্রাকার দাগের উপস্থিতি রোগটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। রোগের আক্রমণে গাছ খাটো বা বামনাকৃতি হয়ে থাকে। আক্রান্ত বীজের অংশ বিশেষ খয়েরি বা কালো বর্ণ ধারণ করে। রোগটি মাঠপর্যায়ে সাধারণত কৃষক এবং জাব পোকার মাধ্যমে আক্রান্ত গাছ হতে সুস্থ গাছে ছড়িয়ে পড়ে।

দমন প্রযুক্তি:

রোগ প্রতিরোধী বাদামের জাত চাষ করতে হবে। জমিতে রোগাক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তুলে পুড়ে ফেলতে হবে। ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে বীজ বপনের পূর্বে প্রোভেঙ-২০০ নামক ঔষধ দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বাহক জাব পোকা দমনের জন্য কীটনাশক হিসেবে ইমিটাফ/গেইন প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি হারে মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করতে হবে।

তিসি

তিসি থেকে তেল এবং আঁশ পাওয়া যায়। তেল ফসল হিসেবে জমির পরিমাণের দিক থেকে সরিষা, তিল এবং সয়াবি-নের পর তিসির স্থান। ফরিদপুর, পাবনা, যশোর, রাজশাহী, কুমিল্লা ও টাঙ্গাইলে তিসি বেশি জন্মে।

তিসির গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ

(১) পাতা ঝলসানো রোগ

লক্ষণঃ

অলটারনেরিয়া লিনি নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগের সৃষ্টি হয়। বৃষ্টি ও ঠান্ডা আবহাওয়া এ রোগ বৃদ্ধির সহায়ক। প্রথমে পাতার ওপর ঘন বাদামি অসম আকৃতির দাগ পড়ে। পরবর্তীতে গাছের পাতা, কাণ্ড, ও ফলে চক্রাকার গাঢ় বাদামি বা কালো দাগের সৃষ্টি হয়। ছোট ছোট দাগগুলো একত্রিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি হয়। দাগগুলো ধূসর, গোলাকার সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ থাকে। আক্রমণের মাত্র বেশি হলে পাতা ঝলসে যায়।

দমন প্রযুক্তিঃ

সুস্থ, সবল ও জীবাণুমুক্ত বীজ বপন করতে হবে। ফসল সংগ্রহের পর পাতা পুড়ে ফেলতে হবে। ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে বীজ বপনের পূর্বে ছত্রাকনাশক অটোস্টিন-৫০ ডব্লিউজিপি অথবা প্রোভেঙ-২০০ প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। পাতায় দাগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে ছত্রাকনাশক রোভরাল-৫০ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে অথবা এমিস্টার টপ৩২৫ এসসি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ২-৩ বার গাছে স্প্রে করতে হবে। একই জমিতে প্রতিবছর ভিন্ন ফসল দিয়ে শস্য পর্যায়ক্রম গ্রহণ করলে রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়।

(২) গোড়া পচা ও ঢলে পড়া রোগ

লক্ষণঃ

স্কেলেরোশিয়াম রলফসি, ফিউজারিয়াম, পিথিয়াম, এবং রাইজোকটনিয়া সোলানি নামক বিভিন্ন ছত্রাক দ্বারা এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রা (২৫০ সে. এর বেশি) রোগবিস্তারের জন্য অনুকূল। চারা ও বয়স্ক অবস্থায় রোগের আক্রমণ হয়। মাটির সংযোগস্থলে পচন ধরে বয়স্ক গাছ হলুদ হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছ ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়।

দমন প্রযুক্তিঃ

রোগ সহনশীল জাত চাষ করতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে ছত্রাকনাশক অটোস্টিন-৫০ ডব্লিউজিপি অথবা প্রোভেঙ-২০০ ডব্লিউপি প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। এ রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ২ গ্রাম হারে অটোস্টিন প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর জমিতে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষ করতে হবে। জমিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে শস্য চাষ করলে জীবাণু মরে যায়।

(৩) মরিচা রোগঃ

লক্ষণঃ

তিসির মরিচা রোগের জন্য দায়ী ছত্রাকের নাম মেলাম্পসোরা লিনি। প্রাথমিক অবস্থায় পাতা, কাণ্ড ও শুঁটিতে ছোট ছোট উজ্জ্বল বর্ণের মরিচার মোট দাগ দেখা যায়। রোগ বাড়ার সাথে সাথে দাগগুলো কালো হয়ে যায়। দাগগুলো পাতার দুই পিঠেই দেখা যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পাতা ঝরে পড়ে এবং ফলন কমে যায়।

দমন প্রযুক্তিঃ

রোগ সহনশীল জাত চাষ করতে হবে। আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়ে ফেলতে হবে। প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম হারে ছত্রাকনাশক অটোস্টিন-৫০ ডব্লিউজিপি অথবা প্রোভেঙ-২০০ ডব্লিউপি মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে প্রতি লিটার পানির সাথে ছত্রাকনাশক টিল্ট-২৫০ ইসি ০.৫ মিলি হারে অথবা ফলিকুর-২৫০ ইসি ১ মিলি হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর জমিতে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। জমিতে অতিরিক্ত ইউরিয়া ও জৈবসার প্রয়োগ না করা।

তেল ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও এদের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

সরিষা

সরিষার ক্ষতিকর পোকামাকড় ও তাদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

এদেশে সরিষার ক্ষতিকর পোকা হলো- জাবপোকা, ফ্লি বিটল, সাধারণ কাটুই পোকা। এর মধ্যে জাবপোকা, সাধারণ কাটুই পোকা বেশিক্ষতি করে।

সরিষার জাবপোকা

জাবপোকা সরিষার সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা। জাবপোকা নরম দেহবিশিষ্ট গোলাকার বা নাশপতি আকৃতির ফ্যাকাশে সবুজ বর্ণের ছোট পোকা। এরা পাখাযুক্ত ও পাখাবিহীন উভয় ধরনের হয়ে থাকে।

ক্ষতির প্রকৃতিঃ

বাচ্চা ও পরিণত জাবপোকা একত্রে সরিষার পাতা, কাণ্ড, পুষ্পমঞ্জরি, ফুল ও ফল থেকে সুচালো মুখ দিয়ে রস চুষে খায়। ফলে গাছ দুর্বল হয়ে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পাতা কুঁকড়ে যায়, ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্ত হয়। আক্রান্ত ফল কুঁচকে ছোট হয়ে যায়। সাধারণত ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে গাছে ফুল ও ফল আসার সময় আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- ❑ অক্টোবরের ২০ থেকে নভেম্বরের ৭ তারিখের মধ্যে স্বল্পমেয়াদি সরিষা জাতের আবাদ করলে পোকার আক্রমণ ৭০% কমানো যায়।
- ❑ আক্রমণ দেখা মাত্র ৫০ গ্রাম আধা ভাঙা নিমবীজ ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে সাথে ২-৩ গ্রাম ডিটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ৭ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করে জাবপোকা দমন করা যায়।
- ❑ শতকরা ১০-২০ ভাগ গাছে জাবপোকা দেখা গেলে মেলাথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মি.লি.পানিতে মিশিয়ে বিকাল ৩ টার পর ১০ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করে পোকা দমন করা যায়।

সাধারণ কাটুই পোকাঃ

সাধারণ কাটুই পোকা শস্যের বহুভোজী পোকা। বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের জেলাসমূহে এ পোকা সরিষার ফসলে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে প্রচুর ক্ষতি সাধন করছে।

ক্ষতির প্রকৃতি

- ❑ এদের কীড়া সরিষা গাছের চারা অবস্থা থেকে শুরু করে পরিপক্ব অবস্থা পর্যন্ত পাতা, কাণ্ড, ফুল ও ফল পেটুকের মতো খেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করে। প্রাথমিক অবস্থায় এ পোকার কীড়াগুলো দলবদ্ধভাবে ১/২টি গাছের পাতা খেয়ে জ্বালিকা সৃষ্টি করে।
- ❑ কীড়াগুলো সারা ক্ষেতে ছড়িয়ে পেটুকের মতো খেয়ে ক্ষতি করে থাকে। ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, ফুল ও ফল ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ডিসেম্বর হতে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি থেকে শুরু করে পরিপক্ব অবস্থা পর্যন্ত সরিষা গাছে আক্রমণ হয়ে থাকে। বিগত কয়েক বছর দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরিষা ফসলে সাধারণ কাটুই পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- ❑ আলোর ফাঁদ দ্বারা মথ ধরে মারা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় এ পোকার শত শত ছোট কীড়া দলবদ্ধভাবে একটি গাছের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে। তখন হাত দ্বারা পাতাসহ দলবদ্ধ কীড়া সংগ্রহ করে মেরে দমন করা যায়।
- ❑ কীড়া আক্রান্ত ক্ষেতে বিঘাপ্রতি ৮/১০টি ডাল পুঁতে দিলে পোকাভোজী পাখি কীড়া খেয়ে পোকা দমন করতে পারে।
- ❑ ফসল বপনের পর সেঙ ফেরেমোন ফাঁদ ব্যবহার করলে প্রচুর সংখ্যক পুরুষ মথ পোকা আকৃষ্ট হয়ে ফাঁদে পড়ে মারা যায়।
- ❑ আক্রমণ বেশি হলে (ক্লোরপাইরিফস + সাইপারমেথ্রিন) গ্রপ ২ মি.লি.প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত খেতে ১০ দিন অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করে পোকা দমন করা যায়।
- ❑ এসএনপিভি ০.৪ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত খেতে ৭ দিন অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

চীনাবাদাম
চীনাবাদামের ক্ষতিকর পোকামাকড় ও তাদের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১। জ্যাসিড
জ্যাসিড বা লিফ হোপার এক প্রকার ক্ষুদ্র সবুজ পোকা। বাচ্চা ও পরিণত অবস্থায় এরা প্রচুর সংখ্যায় গাছের কচি পাতা ও নরম কাণ্ড থেকে রস চুষে খায় এবং খাওয়ার সময় এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ নিঃসৃত করে ফলে পাতার অগ্রভাগ বাদামি বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত পাতা কুঁচকে যায় ফলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্ত হয়। মার্চ হতে জুন মাস পর্যন্ত গাছের চারা থেকে পরিপক্ব অবস্থা পর্যন্ত এদের আক্রমণ হয়ে থাকে।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা
- ❑ চীনাবাদামের সাথে রসুন, পেঁয়াজ বা ধনিয়া আন্তঃফসল হিসাবে চাষ করলে পোকার আক্রমণ শতকরা ২০-২৫ভাগ কম হয়।
- ❑ আক্রমণ দেখা মাত্র ৫০ গ্রাম আধা ভাঙা নিমবীজ ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে সাথে ২-৩ গ্রাম ডটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ৭ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করে জ্যাসিড পোকা দমন করাযায়।
- ❑ আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোপ্রিড ২০০ এস এল, ০.৫ মি: লি: প্রতি লিটার পানিতে আক্রান্ত ক্ষেতে ১০ দিন অন্তর ২/৩ বার ছিটিয়ে পোকা দমন করা যায়।

২। থ্রিপস
সমন্বিত ব্যবস্থাপনা: চীনাবাদামের জ্যাসিড এর দমন ব্যবস্থাপনার অনুরূপ

৩। বিছা পোকা
লালচে কমলা রঙের বিছাপোকা চীনাবাদাম গাছের পাতা কচি কাণ্ড পেটুকের মতো খেয়ে ক্ষতি করে। ফলে গাছের বৃদ্ধি ও ফুল-ফল ধারণ ব্যাহত হয়। এদের আক্রমণে শতকরা ২০-৩০ ভাগ ফলন কম হয়।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা
- ❑ আলোর ফাঁদ দ্বারা মথকে আকৃষ্ট করে ধরে মারা যায়।
- ❑ হাত দ্বারা ডিমের গাঁদা এবং বাচ্চা কীড়াসহ পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করে এদের দমন করা যায়।
- ❑ আক্রমণ দেখা মাত্র ৫০ গ্রাম আধা ভাঙা নিমবীজ ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে সাথে ২-৩ গ্রাম ডিটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ৭ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করে পোকা দমন করা যায়।
- ❑ আক্রান্ত খেতের চারদিকে সেচ নালায় কেরোসিন মিশ্রিত পানি রাখলে চলাচলের সময় কীড়াগুলো পানিতে পড়ে মারা যায়।
- ❑ আক্রমণ বেশি হলে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি ২ মি.লি.প্রতি লিটার পানিতেমিশিয়ে আক্রান্ত খেতে ১৫ দিন অন্তর ২ বার ছিটিয়ে পোকা দমন করা যায়।
- ❑ বিটি পাউডার ১ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত খেতে ১০ দিন অন্তর ৩ বার ছিটিয়ে এ পোকা দমন করা যায়।

৪। কাটুই পোকা:
সমন্বিত ব্যবস্থাপনা:
বিষ টোপ ফাঁদ হিসেবে কার্বারিল ৮৫ এসপি সম্পূর্ণ জমিতে ব্যবহার করে এ পোকা দমন করা যায়। কুমড়া ধানের তুষ দিয়ে একত্রে মার্বেল আকৃতির গোলা তৈরি করে।

৫। উইপোকা
সমন্বিত ব্যবস্থাপনা:
ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছের চারদিকে ছিটিয়ে উইপোকা দমন করা যায়।

তিল
তিলের ক্ষতিকর পোকামাকড় ও তাদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা
তিল হক মথের ক্ষতির প্রকৃতি
তিল হক মথ তিল ফসলের একটি মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা। স্ত্রী মথ তিল গাছের আধাকচি পাতার ওপর পৃষ্ঠে একটি একটি করে প্রায় ৬৪-১০২টি ডিম পাড়ে। ৩-৪ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে ফ্যাকাশে সবুজ বর্ণের কীড়া বের হয়ে কচি পাতা খাওয়া শুরু করে। বয়স্ক কীড়া বেশ বড় এবং হলুদ রেখাযুক্ত সবুজ বর্ণের হয়। এরা পেটুকের মতো তিল গাছের পাতা, কাণ্ড, ফুলকুঁড়ি, ফুল ও ফল খেয়ে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। ফলে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়, ফুল ও ফল ধারণ করতে পারে না এবং ফলন কমে যায়।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা
- ❑ রাতে আলোর সাহয্যে পোকা ধরে মেরে দমন করা যায়। সকালে ও বিকালে কীড়া হাত দ্বারা সংগ্রহ করেমেরে দমন করা যায়।
- ❑ খেতে বিঘাপ্রতি ১০-১২টি কাঠি পুঁতে পাখি বসার সুযোগ করে দিলে শিকারি পাখি সবুজ রঙের কীড়া ধরে খায়।
- ❑ আক্রমণ দেখা মাত্র ৫০ গ্রাম আধা ভাঙা নিমবীজ ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে সাথে ২-৩ গ্রাম ডিটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ৭ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করে পোকা দমন করা যায়।
- ❑ আক্রমণ খুব বেশি হলে ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত খেতে ৭ দিন অন্তর ২/৩ বার ছিটিয়ে পোকা দমন করা যায়।

তিলের বিছাপোকার ক্ষতির প্রকৃতি
বিছাপোকা তিল গাছের অন্যতম প্রধান ক্ষতিকর পোকা। স্ত্রীমথ তিল গাছে পাতার নিচে গাঁদা করে ৫০০-১৫০০টি ডিম পাড়ে। ডিম থেকে ফ্যাকাশে হলুদ রঙের কীড়া বের হয়ে একটি পাতায় দলবদ্ধভাবে থাকে এবং পাতা খেয়ে জালিকা সৃষ্টি করে। লালচে কমলা রঙের বড় বিছাপোকা তিল গাছের পাতা, কাণ্ড, ফুল ও ফল পেটুকের মতো খেয়ে গাছের মারাত্মক ক্ষতি করে। ফলে গাছের বৃদ্ধি ও ফুল-ফল ধারণ ব্যাহত হয় এবং ফলন শতকরা ২০-৩০ ভাগ কমে যায়। ফুল-ফল আসার সময় আক্রমণের মাত্রা বেশি থাকে।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা
- ❑ রাতে আলোর ফাঁদ দ্বারা পোকার মথকে আকৃষ্ট করে ধরে মারা যায়।
- ❑ প্রাথমিক অবস্থায় দলবদ্ধ কীড়াসহ আক্রান্ত পাতা হাত দ্বারা ধ্বংস করে দমন করা যায়।
- ❑ প্রতি বিঘায় ৮-১০টি গাছের ডাল পুঁতে দিলে পোকাভোজী পাখি কীড়া খেয়ে দমন করতে পারে।
- ❑ আক্রমণ দেখা মাত্র ৫০ গ্রাম আধা ভাঙা নিমবীজ ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে সাথে ২-৩ গ্রাম ডিটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে আক্রান্ত খেতে ৭ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করে পোকা দমন করা যায়।
- ❑ আক্রমণ খুব বেশি হলে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি বা (ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি + সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি) ২মি.লি. প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত খেতে ১০ দিন অন্তর ২ বার ছিটায়ে পোকা দমন করা যায়।
- ❑ বিটি পাউডার ০.৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত খেতে ৭ দিন অন্তর ছিটায়ে পোকা দমন করা যায়।

তিলের পাতা মোড়ানো ও ফলছিদ্রকারী পোকার ক্ষতির প্রকৃতি

পাতা মোড়ানো পোকা তিলের অত্যন্ত ক্ষতিকর পোকা। ডিম থেকে সবুজ বর্ণের কীড়া বের হয়ে পাতা খাওয়া শুরু করে। পূর্ণবয়স্ক কীড়া হলদে সবুজ বর্ণের তিলগাছের ওপরের কয়েকটি পাতা মুড়িয়ে ভিতরে বসে খায়। ফলে গাছের পাতা কুচকে ছিদ্রযুক্ত হয়ে যায়। গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্ত হয়। কীড়া ফল ছিদ্র করে ভিতরের নরম অংশ খেয়ে ক্ষতি করে থাকে। অঙ্গজ বৃদ্ধি ফুল ও ফল ধরার সময় আক্রমণের মাত্রা বেশি থাকে।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- ❑ আলোর ফাঁদ দ্বারা পোকা মথকে ধরে দমন করা যায়।
- ❑ মোড়ানো পাতা ও আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে হাত দ্বারা কীড়া মেরে দমন করা যায়।
- ❑ প্রতি বিঘায় ৮-১০টি গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে পোকাভোজী পাখি বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া।
- ❑ আক্রমণ খুব বেশি হলে ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ১০ দিনঅন্তর ২/৩ বার ছিটিয়ে পোকা দমন করা যায়।

সয়াবিন

১। বিছা পোকা

সয়াবিনের মারাত্মক ক্ষতি করে। ডিম থেকে ফোটার পর ছোট অবস্থায় বিছাপোকাগুলো একস্থানে দলবদ্ধভাবে থাকে। আক্রান্ত গাছের পাতা জালের মতো ঝাঁঝরা হয়ে যায়। সহজেই দৃষ্টিগোচরীভূত এ চিহ্ন দেখে পোকাসহ পাতা তুলে পোকা মেরে ফেলা যায়।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা:

পোকার আক্রমণ বেশি হলে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি এর যেকোনো একটি কীটনাশক ঔষধপ্রতি ১ লিটার পানিতে ২ মি.লি.হিসাবে মিশিয়ে ২/৩ বার আক্রান্ত গাছে ছিটাতে হবে।

২। পাতা মোড়ানো পোকা: ইতঃপূবে তিলের ব্যবস্থাপনায় বর্ণনা করা হয়েছে।

৩। কাটুই পোকা: বিষটোপ ফাঁদ হিসেবে কার্বারিল ৮৫ এসপি কুমড়া ধানের তোষ দিয়ে একত্রে গোলা তৈরি করে সম্পূর্ণ জমিতে ব্যবহার করা যায়।

সূর্যমুখী

সূর্যমুখী ফুল হিসেবে আমাদের দেশে বহুল পরিচিত। কিন্তু তৈলবীজ হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর চাষ হয়ে থাকে। সম্প্রতি আমাদের দেশেও তৈলবীজ হিসাবে সূর্যমূখীর চাষ হচ্ছে।

১। সূর্যমুখীর বিছা পোকা:

সমন্বিত ব্যবসহাপনা: ইতঃপূবে তিলের জায়গায় বর্ণনা করা হয়ছে।

২। সাধারণ কাটুই পোকা: শুরুতে পাতার নিচের দিকে বিছা পোকার শুককীটগুলো একসঙ্গে থাকে। পরবর্তীতে শুককীটগুলো বড় হয়ে সারা জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় এদেরকে দমন করা কঠিন। সেজন্য প্রথম অবস্থায় শুককী-টগুলো দেখা দেবার সাথে সাথে মেরে ফেলা উচিত। পোকার আক্রমণ বেশি হলে মি.লি.হারে ঔষধ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৩। থ্রিপস: জ্যাসিড এর ব্যবস্থাপনার অনুরূপ

- ❑ সমন্বিত ব্যবস্থাপনা: এসএনপিভি ০.৪ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত খেতে ৭-১০ দিন অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করে পোকা দমন করা যায়।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়: দয়াকরে রাসায়নিক কীটনাশক সতর্কতার সাথে জমিতে স্প্রে করুন এবং পর-পরাগায়নকৃত ফসলের ক্ষেত্রে বিকাল ৩.০০টার পর কীটনাশক ব্যবহার করুন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative